বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা

অধ্যাপক ডঃ ইউ, এ, বি, রাজিয়া আকতার বানু
তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
469940
469940

মুহাম্মদ জহিরুল আলম
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃনং : ১৭৫
শিক্ষাবর্ষ- ২০০৪-২০০৫ খ্রিঃ

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ দাখিল করা হল)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

469940

মুহাম্মদ জহিরুল আলম

এম.ফিল গবেষক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ ঃ ১০-০১-২০১১খ্রিঃ

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

তারিখ ঃ ১৯-০১-২০১১খ্রিঃ

ডঃ ইউ, এ, বি, রাজিয়া আকতার বানু

অধ্যাপক,

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য "বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ জহিরুল আলম কর্তৃক রচিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

469940

আমার জানামতে লেখক এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেন নাই।

আমি এই গবেষণা নিবন্ধের চূড়ান্ত পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

PAB... 19.1.11

ডঃ ইউ, এ, বি, রাজিয়া আকতার বানু

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা-মা

প্রকৌশলী মুহাম্মদ আনোয়ারুল আলম

ও

জেবুন্নেছা আলম

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিকশর্ত হল নির্বাচন। কিন্তু গণতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বের জন্য চাই যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচন। বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিরই একটি অংশ। কিন্তু প্রতিটি নির্বাচনই বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত নয়টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবগুলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে তা বলা যায় না। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি উঠেছে। সংস্কারের লক্ষ্য হবে নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করা। সংস্কার মানে মাইনাস ফর্মূলা নয়, পদ্ধতির পরিবর্তনই সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য। নির্বাচন ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই এ কথা আজ উচ্চারিত হচ্ছে। পাশাপাশি সময়ের প্রয়োজনে তা সংস্কারের প্রয়োজন এবং সর্ব মহল থেকে এ ব্যাপারে আন্দোলন তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নির্বাচন, বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমাদের দেশে সংকট দেখা দেয়। শুরু হয় নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধের ঘোষণা যা আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বে বেমানান। ফলে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে স্থবির হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির মাঝে সংকট সমাধানের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। জনগণও নির্বাচন নিয়ে আর সংঘাত চায় না। এর উপর ভিত্তি করেই "বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলনঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি মোট দশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণার যথার্থতা, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা, তৃতীয় অধ্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭২-১৯৯০) এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের সমস্যাবলী, ষষ্ঠ অধ্যায়ে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন, সপ্তম অধ্যায়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অষ্টম অধ্যায়ে একটি কেস স্টাডির মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে জনমত তুলে ধরা হয়েছে। আশাকরি আলোচ্য গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকী করণে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান মালিকের অপার দয়ায় এই গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত হয়েছে। আমার গবেষণা কর্মটির সফল সমাপ্তিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দ অনুভব করছি। যে কোন গবেষণা কর্মে একজন গবেষকের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থাকেন আরো অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। তাদের সহযোগিতার প্রতিদান দেয়া অসম্ভব। তারপরও কয়েকজনের অবদানের কথা উল্লেখ করে যতটুকু সম্ভব কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ নষ্ট করতে চাই না।

আমার মত একজন সাধারনের পক্ষে গবেষণা করা কখনো সম্ভব হতোনা যদিনা আমি এমন শিক্ষাগুরু না পেতাম। এই অসামান্য কাজটি আমার জন্য যিনি করেছেন তাঁর প্রতি আমি চিরঋণী, চিরকৃতজ্ঞ। তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ও আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ ইউ.এ.বি. রাজিয়া আকতার বানু। যিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গবেষণা কর্মটি পরিচালনার সার্বিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যা আমার জন্য এক বড় প্রাপ্তি। এমন একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই গর্বিত। আমি আবারও তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ শওকত আরা হোসেন, অধ্যাপক ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান, ড. মাহফুজ পারভেজ সহ ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে।

আমার এ গবেষণায় যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশী ঋণী করেছেন, যিনি নিজের সার্বক্ষণিক ব্যস্ত কর্মময় জীবনের মধ্যে থেকেও আমাকে অসংখ্যবার সময় দিয়েছেন, আমার বিষয়টা অনুধাবন করে আমাকে উৎসাহ, উদ্দীপনা দিয়েছেন, যার অফুরন্ত সহযোগীতা না পেলে আমার এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ, তিনি হলেন দেওয়ানবাগ শরীফের

Dhaka University Institutional Repository

মহাসচিব ড. সৈয়দ এম সাঈদুর রহমান আল্-মাহ্বুবী সাহেব। যাঁর অবদানের কথা আমি কোন দিনও ভুলতে পারব না। আমি তাঁর কাছে চিরঋণী এবং তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সারা জীবনের শুভাকাঙ্ক্ষী, যারা বার বার এই কাজটি সমাপ্ত করার জন্য আমাকে তাগিদ দিয়েছে আমার ছোটভাই মোঃ তানভীর আলম ও আদরের ছোট বোন মালিহা তারান্নুমকে। যারা আমায় অসংখ্য তথ্য সংগ্রহে সাহায্য সহযোগিতা করেছে।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম বন্ধু কাজী ফৌজিয়া লতিফ এর প্রতি। কারণ তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া আমার এই কাজটি করা এত সহজে সম্ভব হতো না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং লাইব্রেরীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের কথা কখনো ভুলবার নয়। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা গেল না। তবুও যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে আমি তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সবার প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা

সূচীপত্র

ঘোষণাপত্র I
প্রত্যয়ন পত্র II
উৎসর্গ III
মুখবন্ধ ..... IV-V
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ..... VI-VII

প্রথম অধ্যায় ..... ১ - ৯
১.১. ভূমিকা
১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
১.৩ গবেষণা পদ্ধতি
১.৪ গবেষণার যথার্থতা
১.৫ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় অধ্যায় ..... ১০ - ২৬
বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা
২.১ নির্বাচন
২.২ বঙ্গীয় আইন সভার বিকাশ
২.৩ পাকিস্তান আমল ঃ নির্বাচন ব্যবস্থার সন্ধানে
২.৪ তথ্যপুঞ্জী

তৃতীয় অধ্যায় ..... ২৭ - ৩৬
স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭২-১৯৯০)
৩.১ সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৩
৩.২ সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৯
৩.৩ সংসদ নির্বাচন : ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ সংসদ নির্বাচন : ১৯৮৮

৩.৫ তথ্যপুঞ্জী

চতুর্থ অধ্যায় ..... ৩৭ - ৫৪

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন

৪.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকার

৪.২ তিন জোটের রূপরেখা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণা

৪.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ১৯৯১ এর নির্বাচন

৪.৪ সাংবিধানিক ভাবে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন : ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ নির্বাচন থেকে ১২ জুন ১৯৯৬ এর নির্বাচন

৪.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ২০০১ সালের নির্বাচন

৪.৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৬-২০০৮

৪.৭ ২০০৮ সালের নিবার্চন

৪.৮ বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সদস্যদের যোগ্যতা ও কার্যাবলী

৪.৯ তথ্যপুঞ্জী

পঞ্চম অধ্যায় ..... ৫৫ - ৬৫

নির্বাচনের সমস্যাবলী

৫.১ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুর্নীতির স্বরূপ

৫.২ নির্বাচন মানেই টাকার ছড়াছড়ি

৫.৩ সামরিক -বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য

৫.৪ দলছুট প্রবণতা ও ডিগবাজি নেতৃত্ব

৫.৫ উত্তরাকির সূত্রে পাওয়া নেতৃত্ব

৫.৬ আদর্শিক দোদুল্যমানতা

৫.৭ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব

৫.৮ রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ

৫.৯ রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ ভূমিকা

৫.১০ তথ্যপুঞ্জী

ষষ্ঠ অধ্যায় ..... ৬৬ - ৯৫

নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন

৬.১ গণতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থার গুরুত্ব

৬.২ নিরপেক্ষ নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা
৬.৪ নির্বাচন কমিশন
৬.৫ নির্বাচনী আইন
৬.৬ বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনামূলক নির্বাচন পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষন
৬.৭ নির্বাচনী সংস্কার
৬.৮ সংস্কার আন্দোলন
৬.৯ সংস্কার প্রস্তাব
৬.১০ নির্বাচন কমিশনের রোডম্যাপ
৬.১১ তথ্যপুঞ্জী

সপ্তম অধ্যায় ..... **৯৬ - ১৪০**
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকা
৭.১ রাজনৈতিক দল
৭.২ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দল
৭.৩ বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল
৭.৪ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল
৭.৫ সিভিল সোসাইটি
৭.৬ বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটি
৭.৭ বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া জোরদারে সিভিল সোসাইটি
৭.৮ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে সিভিল সোসাইটি
৭.৯ তথ্যপুঞ্জী

অষ্টম অধ্যায় ..... **১৪১ -১৫৯**
কেস স্টাডি

নবম অধ্যায় ..... **১৬০ -১৬২**
উপসংহার

দশম অধ্যায় ..... **১৬৩ -১৭৪**
সহায়ক গ্রন্থসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকাঃ

সভ্যতার বিকাশ, রাষ্ট্রগঠন ও সরকার ব্যবস্থাপনায় আজ পর্যন্ত যতগুলো রাজনৈতিক মতবাদ মানব জাতিকে নাড়া দিয়েছে, গণতন্ত্র তার মধ্যে সর্বপ্রাচীন এবং এর আবেদন চিরন্তন। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হচ্ছে নির্বাচন। কারণ গণতন্ত্রে সরকারের কর্তৃত্বের উৎসই হচ্ছে শাসিতের সম্মতি। আর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকারের প্রতি জনগণের সম্মতি প্রতিফলিত হয়। সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সকল নির্বাচনই গণতান্ত্রিক নয়। যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রের কার্যকারিতা থাকে না। তাই গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন একটি অপরিহার্য বিষয়। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যও নির্বাচন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক স্বচ্ছ কর্মকান্ড প্রয়োজন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, নির্বাচন এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবস্থাই বারবার প্রশ্নবিদ্ধ ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রতিটি জাতীয় বা গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন গ্রহণ যোগ্যতা ও বৈধতার প্রশ্নে সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়নি। নির্বাচন ব্যবস্থার নানা দূর্বলতাকে তুলে ধরে পরাজিত পক্ষ নির্বাচন ও নির্বাচিত সরকারকে মেনে নিতে খুব কমই সম্মত হয়। ফলে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন, প্রশ্নবিদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরী করেছে এবং এ কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ নানা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। একইভাবে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক দল, সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ় ভিত্তির জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার সমস্যা ও সংকট দূরীকরণের মাধ্যমে সংস্কার সাধন করার উপর জোড় দিয়ে আন্দোলন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

আজ যদি আমরা আমাদের যাত্রাপথকে বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাব রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, পরিকল্পনাহীনতা, দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অধঃগতি আমাদের অগ্রযাত্রাকে কিভাবে ব্যাহত করেছে। দেশের জনগণ আজ কিছুটা হতাশ। স্বাধীনতার পর কয়েক দশক অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও দেশে স্থীতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরী হয়নি। এ জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী। এ সমস্যা ও

Dhaka University Institutional Repository

সংকট পর্যালোচনা করতে গিয়ে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করছে। এ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকা, দাবী ও তৎপরতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন রাজনৈতিক দীক্ষা বা সামাজিকীকরণের উপায়। নির্বাচন পদ্ধতির প্রতি সমর্থন বা অসমর্থন করার সাথে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি অসমর্থন করার একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচন গণতান্ত্রিক ভাবধারার সমগামী।

নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার এখন সময়ের দাবি। বিষয়টি সকল রাজনৈতিক দল হতেও কমবেশী উচ্চারিত হয়েছে। দেশের ভোটার সমর্থকদের ৭০-৮০ শতাংশই এ সংস্কারের পক্ষে। দলীয় গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় রদ বদল, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, সদস্য সংখ্যার তালিকা ও দলের তহবিলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা দরকার। সংস্কারের উপর আগামী রাজনীতির গতিবিধি ও দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সমাজ উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটিয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই রাষ্ট্রের পত্তন, বিকাশ ও স্থায়িত্ব। দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কার, সুষ্ঠু নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক আগে থেকেই সিভিল সোসাইটির সদস্যরা সরকার ও দেশবাসীর সামনে করণীয়গুলো তুলে ধরেছেন। তাদের মূল কথা - একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কিছু মৌলিক পদক্ষেপ সরকারকে নিতে হবে। আর এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে দেশের রাজনৈতিক শক্তি, নাগরিক সমাজ, ব্যবসায়ী সমাজ সবার সঙ্গে সরকার সম্পর্ক বজায় রাখবে। এক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির মনোভাব হলো নতুন অর্থনীতি, নতুন সমাজের জন্য নতুন রাজনীতি। সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিরা মনে করেন নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের সঙ্গে অন্যান্য সংস্কারের আন্তসম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে একটি বিষয় পরিস্কার তা হলো নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার। এজন্য রাজনৈতিক সংস্কার, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, আইন তৈরি প্রয়োজন। সংস্কারের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহন নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল নারী সদস্য রাখার বিধান। রাজনৈতিক দলের নীতি নির্ধারণে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার মনোনয়নে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়লে দলের গুনগত

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন হবে। জাতীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিকাশ আমাদের উন্নয়নের সহায়ক। যেহেতু নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের সুযোগ এখনই, তাই আমাদেরকে নির্বাচনী সংস্কারে নারী প্রসঙ্গের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিতে সংস্কার শব্দটি স্থান করে নিয়েছে। নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন পদ্ধতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার সর্বত্রই আলোচিত হয়। অনেক সচেতন নাগরিক ও নাগরিক সংগঠনও এ ক্ষেত্রে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছে। আমাদের রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন ও সুষ্ঠু ভিত্তির উপর দাড় করাতে হলে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন।

সংস্কার আনতে হবে সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান রাজনীতিকদের হাতে দেশ পরিচালনার ভার দেওয়া, যা নিশ্চিত করবে সুশাসন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র। এর কোনটিই একটি অপরটির সঙ্গে বিনিময়যোগ্য নয়। সুশাসন ব্যতিরেকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র থাকে না , আবার এর কোন একটির অনুপস্থিতিতে সুশাসন হয় না। তাই প্রধিনিধি নির্বাচন, উপযুক্ত সাংসদ নিয়ে গঠিত সংসদ, যোগ্য নেতৃত্বের প্রশাসন, দুর্নীতি মুক্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, অবাধ ও মুক্ত তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা ছাড়া গত্যান্তর নেই ।

বাংলাদেশের রাজনীতিকে ইতিপূর্বে নানাভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। "বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক গবেষণাকর্মটিতে বাংলাদেশের রাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে নির্বাচনী ব্যবস্থার 'প্রেক্ষিতে। এখানে মূলত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর উপর ভিত্তি করে তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে বিশ্বাস রাখছি।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

গবেষণা মাত্রই একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে। একেকজন গবেষক একেকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। গবেষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় নিয়ে বিশেষ অনুসন্ধান চালানো হয়।"বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলনঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটিতে বাংলাদেশের বিদ্যমান সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির মনোভাব, কর্মতৎপরতা ও প্রস্তাবনা সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই প্রত্যাশা করি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিটি সরকার দেশের সেবা করার দায়িত্বভার গ্রহণ করুক। আলোচ্য গবেষণাটি নিম্নলিখিত প্রধান উদ্দেশ্য সমূহকে বিশ্লেষণ করবে -

ক. গণতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থার গুরুত্ব

খ. বাংলাদেশের নির্বাচন (১৯৭৩-২০০৮) সমূহের ত্রুটি ও সমস্যা সমূহ

গ. নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রশ্নে রাজনৈতিক দল সমূহের প্রস্তাব দাবি ও তৎপরতা

ঘ. নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রশ্নে সিভিল সোসাইটি ও উন্নয়ন সহযোগীদের প্রস্তাব দাবি ও তৎপরতা

ঙ. সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত দাবি, প্রস্তাবকে পর্যালোচনা করে তুলনামূলক আলোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার পদ্ধতিঃ

গবেষণা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান, নতুন তথ্য এবং নতুন সত্যের সন্ধান লাভ করার প্রচেষ্টা, অর্থাৎ মানুষের আত্ম জিজ্ঞাসার একটি সুনিশ্চিত রূপ হচ্ছে গবেষণা।

গবেষণায় সামাজিক সমস্যাবলী পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য নিম্ন লিখিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয় ঃ

দার্শনিক পদ্ধতি ঃ যে পদ্ধতিতে সমাজ এবং সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাকে দার্শনিক পদ্ধতি বলে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি ঃ ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা মানব সমাজের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যধারা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য অতীত সভ্যতা ও সামাজিক আচারবিধি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করে থাকি।

নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ঃ নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে আদিম সমাজ সমূহের পরিবার, সমাজ, সমবায়, ক্ষমতায় কাঠামো, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান তথা বিভিন্ন আর্থ সামাজিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ঘটনা বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ এমন অনেক সামাজিক প্রপঞ্চ আছে যা সম্পর্কে জরিপ পদ্ধতিতে পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না অথবা পেলেও তা যথেষ্ট নয় কিংবা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সমূহের ব্যাপক প্রযোজ্যতা অনুধাবনে যথেষ্ট নয়, ঐসব ক্ষেত্রে ঘটনা বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে কোন বিষয়ে প্রধানত সংখ্যা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে না ধরে গুনগত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা এবং লিখিত বা মৌখিক ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের রীতিবদ্ধ, বস্তু নিরপেক্ষ এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনাকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলা হয়।

পরীক্ষণ পদ্ধতি ঃ সামাজিক গবেষণায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে অতীব তুল্য পদ্ধতি হচ্ছে পরীক্ষণ দ্ধতি। এ পদ্ধতিতে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত দলসমূহ থেকে একটিকে নিয়ন্ত্রিত দল এবং একই বৈশিষ্ট্য ন্ডিত অপর দলটিকে অনিয়ন্ত্রিত দল হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার পদ্ধতিঃ

গবেষণা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান, নতুন তথ্য এবং নতুন সত্যের সন্ধান লাভ করার প্রচেষ্টা, অর্থাৎ মানুষের আত্ম জিজ্ঞাসার একটি সুনিশ্চিত রূপ হচ্ছে গবেষণা।

গবেষণায় সামাজিক সমস্যাবলী পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য নিম্ন লিখিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয় ঃ

দার্শনিক পদ্ধতি ঃ যে পদ্ধতিতে সমাজ এবং সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাকে দার্শনিক পদ্ধতি বলে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি ঃ ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা মানব সমাজের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যধারা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য অতীত সভ্যতা ও সামাজিক আচারবিধি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করে থাকি।

নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ঃ নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে আদিম সমাজ সমূহের পরিবার, সমাজ, সমবায়, ক্ষমতায় কাঠামো, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান তথা বিভিন্ন আর্থ সামাজিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ঘটনা বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ এমন অনেক সামাজিক প্রপঞ্চ আছে যা সম্পর্কে জরিপ পদ্ধতিতে পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না অথবা পেলেও তা যথেষ্ট নয় কিংবা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সমূহের ব্যাপক প্রযোজ্যতা অনুধাবনে যথেষ্ট নয়, ঐসব ক্ষেত্রে ঘটনা বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে কোন বিষয়ে প্রধানত সংখ্যা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে না ধরে গুনগত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা এবং লিখিত বা মৌখিক ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের রীতিবদ্ধ, বস্তু নিরপেক্ষ এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনাকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলা হয়।

পরীক্ষণ পদ্ধতি ঃ সামাজিক গবেষণায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে অতীব তুল্য পদ্ধতি হচ্ছে পরীক্ষণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত দলসমূহ থেকে একটিকে নিয়ন্ত্রিত দল এবং একই বৈশিষ্ট্য মন্ডিত অপর দলটিকে অনিয়ন্ত্রিত দল হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জরিপ পদ্ধতি ঃ জরিপ পদ্ধতি হলো বিভিন্ন কৌশলে তথ্যাবলী সংগ্রহ, তথ্যাবলীর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়ায়। এ পদ্ধতিতে গবেষক আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে নেন, তিনি কোন সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ সংগ্রহ করতে চান এবং সেভাবে তার জরিপের উপকরণ সমূহ প্রস্তুত করে নেন। যাতে করে অতি সহজে সে তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত জরিপে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার মালা, ছক ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, যাতে জরিপ পরিচালনাকারী অত্যন্ত সহজেই তার সংগৃহীত তথ্যসমূহ রেকর্ড করতে পারেন।

উপাত্ত/তথ্য ঃ সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় মানুষের প্রতিক্রিয়ার ফলাফলই হচ্ছে উপাত্ত। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি বা প্রশ্নমালার প্রয়োগে মানুষের আচরণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করি তাই হচ্ছে উপাত্ত।

পরিসংখ্যান গবেষণার কাজে গৃহীত পরীক্ষন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা। সংগৃহীত তথ্যের নির্ভুলতা ও উৎকর্ষতার উপরই সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন ও ফলাফলের সঠিকতা নির্ভর করে। অতএব পরিসংখ্যান নীতি অনুসরণ করেই তথ্য সংগ্রহ করা উচিত।

তথ্যের উৎসের ভিত্তিতে তথ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

প্রাথমিক তথ্য ঃ যে তথ্য মৌলিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল উৎস হতে সংগ্রহ করা যায়, তাকে প্রাথমিক তথ্য বলে। তথ্য সংগ্রহ করার পর যদি উহাতে কোন পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা না হয়ে থাকে, তবে তাকে প্রাথমিক তথ্য বলা হয়।

মাধ্যমিক তথ্য ঃ যে তথ্য পরোক্ষ উৎস হতে সংগ্রহ করা হয় বা কোন প্রকাশনা হতে সংগ্রহ করা হয় তাকে মাধ্যমিক তথ্য বা পরোক্ষ তথ্য বলে।

এই গবেষণা কর্মটিতে তথ্য সংগ্রহে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য প্রাথমিক পদ্ধতির চেয়ে মাধ্যমিক পদ্ধতিই অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বে যে গবেষণা হয়েছে সেসব উৎস, সংশ্লিষ্ট বিষয়ক বিভিন্ন জার্নাল, বই, সরকারি নথিপত্র, দৈনিক পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন-এর সংবাদ এবং ইন্টারনেট থেকে তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটির সর্বক্ষেত্রেই পরিমানের চেয়ে গুনের উপর অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণার যথার্থতাঃ

নির্বাচন সংক্রান্ত গবেষণা নানা কারনে গুরুত্বপূর্ণ। ভোট বা নির্বাচন আচরনের মধ্য দিয়ে জনমত, দলীয় কার্যক্রম, রাষ্ট্রীয় নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচরণসহ সর্বোপরি রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনের বিভিন্ন সূত্র প্রকাশ পায়। অপ্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির অনেক কৌতুহল উদ্দীপক উপাদান নির্বাচন সংক্রান্ত আচরনের সাথে সংযুক্ত। তাছাড়া সাধারণ মানুষের কাছেও বিষয়টি আগ্রহপূর্ণ। উন্নত বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রায় সকল নির্বাচনই কোন না কোনভাবে সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা গবেষিত হয়ে আসছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলত পশ্চিমা ধাচের গণতন্ত্র কার্যকর রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এসব রাষ্ট্রগুলোতে সমাজের সকল স্তরে গণতন্ত্র কার্যকর রয়েছে এ কথা বলা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হবার পর সেই নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলো যে আশা নিয়ে গণতন্ত্রকে বেছে নেয়, স্বাধীনতার অল্প সময়ের মধ্যেই তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখে পরে। ফলে সংস্কার সহ নানা কার্যক্রম আমরা লক্ষ্য করি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রসঙ্গটি চলে আসে। বাংলাদেশেও গণ তান্ত্রিক রীতি নীতির চর্চা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের আন্দোলন তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে। রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটিও সংস্কারের ব্যাপারে একমত। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়টি গবেষণায় চলে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গবেষণার প্রয়োজনীয়তাঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি অপরিহার্য বিষয়। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য তাদের পছন্দানুযায়ী নেতা বা প্রতিনিধি বাছাই করে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। বস্তুত: ক্ষমতার বৈধকরণ ও হস্তান্তরের উপযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এই পদ্ধতির দ্বারাই সুসম্পন্ন হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ অন্য বিবেচনাতেও মূল্যায়নের দাবি রাখে। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ আত্মসচেতন, আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন হয়ে উঠার সুযোগ পায়। এর মাধ্যমেই তারা নিজেকে রাজনৈতিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মনে করেন। নির্বাচন রাজনৈতিক দীক্ষা ও সামাজিকীকরণের উপায় এবং জাতীয় সংহতির সহায়ক। নির্বাচনের মাধ্যমে জাতি রাষ্ট্রের গঠনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকতর তাগিদ অনুভব করতে পারে। প্রতিটি বিষয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে নির্বাচনের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা উন্নয়নশীল বিশ্বে নির্বাচনকে কখনও কখনও বৈধতার প্রশ্নে সংকটাপন্ন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সংকট মুক্তির পথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি এ সকল দেশে নির্বাচনকে আমলা ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ মুক্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারা বিকাশের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবেও মূল্যায়ন করা হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের চাকা সচল রাখার জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি সকলের। ফলে সৃষ্টি হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ নানা ব্যবস্থার। ধীরে ধীরে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার প্রসঙ্গটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলগুলো নিজ থেকেই নানা প্রস্তাব জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারে। পাশাপাশি সিভিল সোসাইটি থেকে যথেষ্ট তৎপরতাও পরিলক্ষিত হয়। দেশের ভোটার সমর্থকগণও এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের আশা -আকাঙ্খা পূরণের জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম। এতে যদি কোন সমস্যা আসে তবে তা সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করা প্রয়োজন এবং প্রত্যেকের প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। এই গবেষণা কর্মটিতে বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন এবং সংস্কার কার্যক্রমকে স্বার্থক করে তোলার জন্য রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকা, দাবি ও তৎপরতা তুলে ধরা হয়েছে। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা

২.১ নির্বাচন ঃ

মানব সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। নিজের বিকাশ সাধনে মানুষ পরিবর্তনকে ভালবাসে। কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানবের সমর্থন নিয়ে এ পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যেই নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্বাচন হল এক প্রকার বাছাই প্রক্রিয়া। প্রাচীন গ্রিসীয় শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল নির্বাচন। স্থানীয় প্রধানের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে এবং মুঘল শাসনেও পাওয়া যায়। বাংলার গ্রামের লোকেরা নিজ নিজ গ্রামের মোকাদ্দম বা গ্রাম প্রধান, পাটোয়ারী বা কর আদায়কারী নির্বাচন করত। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে জনমনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সরকারের কার্যাবলী অবশ্যই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। এ ধারনার ফল হল নির্বাচন, নির্বাচকমন্ডলী ও প্রতিনিধি বাছাইয়ের।

পূর্বের নগর রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা দুই ছিল কম। ফলে সেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছিল। অর্থাৎ সকলে মিলে আইন প্রণয়ন ও শাসন কার্য পরিচালনা করত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় ক্ষেত্রে বিশাল। তাই এ ধরনের বিশাল আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত জাতীয় রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের। নির্বাচন হল জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি বাছাইয়ের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি। অর্থাৎ যে মাধ্যমের দ্বারা জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার বলে তাদের নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি মনোনীত করেন তাই নির্বাচন। অ্যানাল বলের মতে নির্বাচন হল, Election is the means by which the people choose and exercise some degree of control over thier representatives [১] নির্বাচন হল প্রতিনিধি বাছাই এবং সে প্রতিনিধির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রন আরোপের উপায় বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের একটি মাত্র সময়, সেটা হচ্ছে নির্বাচন। নির্বাচনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে যে কথাটি, সেটি হচ্ছে ভোট। জনগণ এ ভোটের মাধ্যমেই তার নিজ মতামত ব্যক্ত করে গণতান্ত্রিক অধিকারটি প্রয়োগ করে থাকেন।

২.২ বঙ্গীয় আইন সভার বিকাশঃ

প্রাক-বৃটিশ যুগের সরকার পরিচালিত হতো নবাবের ইচ্ছা মাফিক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধি নিষেধ, সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত ছিল হুকুমত, যাকে আমরা সনাতন শাসনতন্ত্র বলে অভিহিত করি। ইংরেজ শাসকরা ইচ্ছাকৃত ভাবে এ দেশে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাননি। তবুও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইংরেজদের নিজ দেশের রাষ্ট্রচিন্তা ও বিধি ব্যবস্থা এ উপমহাদেশে আত্ম প্রকাশ করে। উপমহাদেশে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ক্রমান্বয়ে, ধাপে ধাপে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণকে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী G.W. Chowdhury "Democracy by instalments" বলে অভিহিত করেছেন।[২] কোম্পানীর স্বৈরশাসনের মধ্য দিয়ে সূত্রপাত ঘটে ঔপনিবেশিক শাসনের এবং ক্রমশ তা পশ্চিমা শাসনতান্ত্রিক আদলে রূপান্তরিত হয়। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশের মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়ার সূচনা হয় এবং চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় রাজা ধারাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্র ঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' যা সর্ব প্রথম বাংলায় প্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ১৮৬১ সালের ১ আগস্ট ভারতীয় কাউন্সিল আইন ঘোষিত হয়। এ আইনে বঙ্গীয় আইন সভা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয় তবে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি বা যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালী সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা ছিল না। শাসনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় বঙ্গীয় আইন সভার বিকাশ তথা নির্বাচিত প্রতিনিধি পাওয়ার ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা-

(ক) প্রাথমিক পর্যায়	১৮৬২-১৯১১
(খ) মধ্যবর্তী পর্যায়	১৯১২-১৯৩৪
(গ) চূড়ান্ত পর্যায়	১৯৩৫-১৯৪৭

Dhaka University Institutional Repository

(ক) প্রাথমিক পর্যায় (১৮৬২-১৯১১)ঃ১৮৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারী, শনিবার, বঙ্গীয় আইন সভার উদ্বোধনী অধিবেশেন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আইন সভায় ল্যাফটেনেন্ট গর্ভনর স্যার জন পিটার গ্যান্ট পদাধিকার বলে সভাপতি এবং বার জন মনোনীত সদস্য ছিলেন। বার জন সদস্যের মধ্যে চারজন সরকারী ও চারজন বেসরকারি বিদেশী এবং চার জন বাঙালী ছিলেন। বাঙালীরা হলেন মৌলভী আবদুল লতিফ, রাজা রাম মোহন রায়ের কনিষ্ঠ ছেলে রাজা রাম প্রসাদ রায়, বর্ধমানের জমিদার রাজা প্রতাপ চন্দ্র এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের চাচাতো ভাই প্রসন্ন কুমার ঠাকুর।[৩] আইন সভায় " Fines on Villages for Outrages and Trespasses Committed" নামক শিরোনামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। গণবিরোধী এ সংশোধনটি মৌলভী আব্দুল লতিফ ছাড়া সকলেই সম্মতি প্রদান করেন। তাছাড়া সকল প্রকার সরকার বিরোধী বক্তব্য, আন্দোলন ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করবার জন্য বৃটিশ সরকারের ১৮৭৮ সালে 'Vernacular Press Act ' নামক আইন দুটি বিনা বিরোধীতায় পাশ হয়।[৪] আইন সভার সদস্যবৃন্দ বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করায় মফস্বলের নতুন নেতৃবৃন্দ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন থেকে বেরিয়ে এসে 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' গঠন করেন।[৫] বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা দেশের অন্যান্য স্থানের জাতীয়তাবাদীদের সাথে মিলে ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। 'কংগ্রেস' প্রথম অধিবেশনেই স্থানীয় আইন সভায় বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় নির্বাচিত সদস্য থাকার কথা প্রস্তাব করে।

১৮৯২ সালে সংস্কার আইন পাশ হয়। এ সংস্কার আইনে তের জন সদস্যের পরির্বতে বঙ্গীয় আইন সভায় একুশ জন সদস্য রাখার বিধান করা হয়। এর মধ্যে দশ জন ছিলেন মনোনীত সদস্য। ১৮৯২ সালের আইনে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ঐ আইনে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের কোন বিধান করা হয়নি। বেসরকারি সদস্যগণ বাজেট আলোচনা করতে পারতেন কিন্তু এ বিষয়ে ভোট প্রদানের অধিকার ছিল না। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী বঙ্গীয় আইন সভায় বেসরকারি সদস্যদের অবস্থান প্রসঙ্গে বলে-"কাউন্সিলের অভ্যন্তরে সরকারি সদস্যদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দেশ ও জনগণের স্বার্থ নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা বেসরকারি সদস্যদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন

Dhaka University Institutional Repository

ছিল"।[৬] বৃটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সুবিধার কথা উল্লেখ করে ১৯০৫ সালে বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিভক্ত করেন। এ সময় ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে একটি নতুন দল সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

১৯০৯ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি সংস্কার আইন পাশ হয়। এই সংস্কার আইনের ধারা অনুযায়ী ভারতীয় বৃটিশ সরকার ১৯০৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গীয় আইন সভার নতুন কাঠামো ঘোষণা করে। উক্ত কাঠামোতে সতের জন সরকারি অফিসার ও একত্রিশ জন বেসরকারি সদস্যের বিধান করা হয়। এ আইনের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কোন বিধান করা হয়নি।[৭]

(খ) মধ্যবর্তী পর্যায় (১৯১২-১৯৩৪)ঃ

১৯১৩ সালের ১৮ জানুয়ারী নবগঠিত বঙ্গীয় আইন সভার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ সালে বিশ্ব ব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে আইন সভার কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্যাপক বিস্তার লাভ করলে ভারতের ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ড এবং সেক্রেটারি অব স্টেট মন্টেগুর যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী পার্লামেন্টে একটি সংস্কার আইন পাশ হয় এবং ১৯১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার প্রস্তাব রাজার অনুমতি পায় এবং তা আইনে পরিণত হয়। এ আইনে সত্যিকার অর্থে ভারতে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যবস্থার সূচনা ঘটে এবং সর্ব প্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচলন হয়। বঙ্গীয় আইন সভায় জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১১৪ জন করা হয়।[৮] ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯২০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সমস্ত ভারতে অসহযোগ আন্দোলন এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। সে সময় প্রায় শতকরা ৮০ জন ভোটার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

১৯২৩ সালের নভেম্বরে বঙ্গীয় আইন পরিষদের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন ছিল বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৩৯ সদস্য বিশিষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১১৪ আসনে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগ ব্যতীত দলভিত্তিক বা দলগতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

সারণি ঃ ১৯২৩ সালের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
স্বরাজ পার্টি	৪২
কংগ্রেস	২৯
স্বতন্ত্র	২৫
ইউরোপীয়	১৮
মোট	১১৪

উৎস ঃ The Statesman (Calcutta), December-1, 1923

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে বলা হয় যে, যেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে শতকরা ৬০টি হিন্দু আসন এবং ৪০টি মুসলিম আসন থাকবে। আর যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে শতকরা ৬০টি মুসলিম আসন ও ৪০টি হিন্দু আসন থাকবে। ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে বেঙ্গল প্যাক্ট দলের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পায়।[৯]

স্বরাজ পার্টির শক্তিশালী অবস্থান সরকারকে অনেকাংশে দায়িত্বশীল করে তোলে। স্বরাজীদের দৃঢ় প্রচেষ্টার কারণে সরকার কর্তৃক উত্থাপিত "Bengal Ordinance" এবং সংশোধনী এবং "Criminal Law Amendment Bill" টি বাতিল হয়ে যায়। বিলের বিপক্ষে ৬৯টি ভোট এবং পক্ষে ৬৩টি ভোট পড়ে।[১০]

১৯২৬ সালে বঙ্গীয় আইন সভার তৃতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন স্বরাজ পার্টি পরাজিত হয়। কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। গর্ভনর আবদুল করিম গজনবী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ঐ মন্ত্রি পরিষদ 'গাজা চক্র' মন্ত্রি পরিষদ নামে পরিচিতি ছিল।[১১] এ কাউন্সিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিরোধী গ্রুপ কর্তৃক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন। ঐ অনাস্থা প্রস্তাব গজনবীর বিরুদ্ধে ৬৬-৬২ ভোটে এবং চক্রবর্তী বিরুদ্ধের ৬৮-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ভোটে পাশ হয়। এরপর অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয়। এর মাধ্যমে বঙ্গীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।[১২]

(গ) চূড়ান্ত পর্যায় (১৯৩৫-১৯৪৭)ঃ

১৮৬১ সালে বঙ্গীয় আইন সভার যে সূচনা হয় তা পরিপূর্ণতা অর্জন করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা। এ আইনে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ ও আইন সভার সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করা হয়। এ আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে রাষ্ট্রীয় আইন সভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৩টি দল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি অংশ গ্রহণ করে।

সারণি ঃ ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
কংগ্রেস	৬০
মুসলিম লীগ	৪০
কৃষক প্রজা পার্টি	৩৫
স্বতন্ত্র মুসলমান	৪১
স্বতন্ত্র হিন্দু	১৪
স্বতন্ত্র তফসিলী সম্প্রদায়	২৩
ইউরোপীয়	২৫
এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
মোট	২৪২

উৎস ঃ Indian Annual Register, Vol-1, 1937, p 59-60

১৯৪৬ সালে পুনরায় বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, কংগ্রেস ও সিপিআই (ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি) অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
মুসলিম লীগ	১১৪
কংগ্রেস	৮৬
কৃষক প্রজা পার্টি	৩
স্বতন্ত্র তফসিলী	২
স্বতন্ত্র মুসলমান	৩
স্বতন্ত্র হিন্দু	৪
ভারতীয় খৃষ্টান	২
ইউরোপীয়	২৩
সিপিআই	৩
মোট	২৪০

উৎস ঃ The Statesman (Calcutta) April-2, 1946

সাধারণ নির্বাচন চালু হওয়ার পর বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি হিসেব কাজ করা শুরু করেন। নির্বাচন ব্যবস্থার বিকাশ এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটায়। যে নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে এ অঞ্চলের মানুষ পরিচিতি ছিল সময়ের আবর্তনে তা আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গীয় আইন সভার যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা গুনগত ও মর্যাদার দিক থেকে অনেক উন্নত মানের ছিলেন।

১৯৪৬ সালের ২৩ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ সময় মন্ত্রিমিশন ভারতে উপস্থিত হয়। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন শ্রীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতে উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির লগ্ন থেকেই পূর্ব বাংলায় গণতন্ত্রের বিকাশ এবং তার সার্থক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ রাজনৈতিক মহলের গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ পাকিস্তান আমল ঃ নির্বাচন ব্যবস্থার সন্ধানে

পাকিস্তান তৈরি করার সময় অনেকে ধারনা করেছিল পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বৃটিশ যুগের চেয়ে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে পাকিস্তানে শাসন ব্যবস্থা বৃটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থা বা বঙ্গীয় আইন সভার চেয়ে আরো উন্নত না হয়ে আরো অবনত হয়। উপনেবিশক আমলের শাসন ব্যবস্থাকেই নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেয়-

"But though the Asian nationalist leaders spoke and fought against western Imperialism, by and large they did not challenge or reject the ideology and value system of western colonial masters" [১৩]

বৃটিশ যুগে যতটুকু গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল অচিরেই পাকিস্তানে সেটুকু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থারও অবসান ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রথম দিকে কিছু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করা হলেও অধিকাংশ সময় শাসিত হয় সামরিক শাসন দ্বারা। আর নির্বাচন হয়ে উঠে এক কল্পনার বিষয়। পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বদলে উপনিবেশে পরিণত হয়।

১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের যাত্রা শুরু হয়। এ সময়কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ (১৯৪৭-৫৪)

(খ) দ্বিতীয় প্রাদেশিক পরিষদ (১৯৫৪-৫৮)

(ক) প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ (১৯৪৭-৫৪)ঃ

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট অবিভক্ত বাংলার প্রায় তিন পঞ্চমাংশ এলাকা নিয় গঠিত পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়। অবিভক্ত বঙ্গীয় আইন পরিষদের ১৪১ জন সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

এবং আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার ৩০ জন নির্বাচিত সদস্যের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ যাত্রা শুরু করে।

প্রদেশ ওয়ারী আইন সভার সংগঠন, ১৯৪৭-৫৪

প্রদেশ	বঙ্গীয় আইন সভা হতে আগত সদস্য	আসাম আইন সভা হতে আগত সদস্য	মোট আসন পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ
১.মুসলিম আসন	৯৮	১৮	১১৬
ক. সাধারণ	২০	৮	২৮
খ. নিম্নবর্ণের জন্য সংরক্ষিত	১৮	৩	১৮
২. খ্রীষ্টান	১	০	১
৩. জমিদার শ্রেণী	৩	০	৩
৪. বিশ্ববিদ্যালয়	১	০	১
৫. শ্রমিক	৩	১	৪
মোট	১৪১	৩০	১৭১

উৎস ঃ Najma Chowdhury, "The legislative process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58", p-18

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের সন্ধানে ঃ

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব বাংলার গর্ভনর নিযুক্ত হন স্যার ফ্রেডারিক ক্লেমারস রোন আর মূখ্যমন্ত্রী হন মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক বছরেই জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভাষা ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রশ্নে অব্যাহত মতানৈক্যের কারণে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আওয়ায়ী মুসলীম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মতো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রশ্নে এই বিরোধ আরো ঘনীভূত হয়। বাঙালীদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন পাকিস্তানের পূর্বাংশে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। আর তাই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবনতাকে উৎসাহিত করে। পার্ক ও হুইলারের মতে ঃ "ক্রমান্নয়ে পূর্ব পাকিস্তানিরা বুঝতে পারে যে, তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানিদের ইচ্ছার অধীন হয়ে পড়েছে, পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করছে। ভাষাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাকে পরিহার করে উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে জনপ্রিয় করার পদক্ষেপ গৃহীত হলে এই মনোভাব আরো ঘনীভূত হয়। কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগ সরকারের প্রতি এই অসন্তোষের পাশাপাশি প্রাদেশিক মুসলীম লীগ সরকারের দুর্নীতি এবং অদক্ষতা পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে তোলে।[১৪]

১৯৪৯ সালে মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন তাঁর নিজের জেলা ময়মনসিংহের একটি উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের ফলে শূণ্য আসনগুলোর উপ-নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে দেন।[১৫]

১৯৫৩ সালের শেষ দিকের প্রাদেশিক আইন সভার ৩৪টি আসন ছিল শূণ্য। G.W. Chowdhury মন্তব্য করেন-" এমনকি প্রাদেশিক আইন সভার কার্যকাল ও কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্দেশে বাড়ানো হয়, অথচ কেন্দ্রীয় আইন সভা নিজেই স্বাধীনতার পূর্বে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছিল"।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

(খ) দ্বিতীয় প্রাদেশিক পরিষদ (১৯৫৪-৫৮)ঃ

১৯৫৩ সালের ২৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের মুসলিম লীগের উপর আর কোন আস্থা নেই। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ শেখ মজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন, অক্টোবর-১৯৫৫, ২১) ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান দ্বিতীয় প্রাদেশিক পরিষদের যাত্রা শুরু হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে। ১৯৫৩ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাচনের প্রতি অনাগ্রহের কারণে তা ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বকালীন ভোটাধিকার এবং স্বতন্ত্র নির্বাচকমন্ডলী এই দুই নীতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণ কমিটি যথাসময়ে সরকারের কাছে এর চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে না পারায় নির্বাচন বিলম্বিত হয়।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারনা ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে গৃহীত ২১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। মুসলিমলীগ পূর্ব বাংলার ভোটাধিকার আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট আইন পরিষদের মোট ৩০৯ আসনের মধ্যে এককভাবে ২২৮টি আসন লাভ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম মাত্র ৯টি আসন লাভ করেন।

সারণি ঃ ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দল	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
যুক্তফ্রন্ট	২২৮ জন
আওয়ামী মুসলিম লীগ (যুক্তফ্রন্ট)	১৩ জন
কৃষক শ্রমিক পার্টি	৪৮ জন

Dhaka University Institutional Repository

(যুক্তফ্রন্ট)	
নেজামে ইসলাম (যুক্তফ্রন্ট)	২২ জন
খিলাফতে রাব্বানী (যুক্তফ্রন্ট)	২ জন
পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪ জন
ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি	৫ জন
তফসিলী ফেডারেশন	২৯ জন
গণ সমিতি (কংগ্রেস)	১৪ জন
মুসলিম লীগ	৯ জন
বৌদ্ধ	৯ জন
খ্রিস্টান	১ জন
মোট	৩০৯ জন

উৎসঃ রশিদ, হারুন-অর, বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০১), ২০০৩ পৃ-১৬০

৩ এপ্রিল এ.কে.ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষি, শরিকি দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক মত ভিন্নতার কারণে ১৯৫৪-৫৮ সাল পর্যন্ত মোট ছয়বার সরকার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়। সুদীর্ঘ ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয় এবং এটি ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর হয় এবং কার্যকরী হওয়ার আড়াই বছরের মাথায় এটি বাতিল করা হয়। নতুন সংবিধান পাশ

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার পরপরই ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যুক্ত নির্বাচন (Joint Election) ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে আহ্বান জানান। এ সময় কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে রাজনীতি অতিমাত্রায় অস্থিতিশীল হয়ে পরে এবং কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা নিজের ক্ষমতা কুক্ষিগত করবার জন্য সামরিক বেসামরিক আমলাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। এর মাত্র ২০ দিন পরে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল নেন। এর পরবর্তী এক দশকেরও বেশী সময় ধরে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি শাসিত হয়েছে এক নায়কতান্ত্রিক সামরিক শাসকদের অধীনে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে জেনারেল আইয়ুব খান শাসনতন্ত্র বাতিল করলেন। ১৯৫৯ সালের ৬ আগস্ট জেনারেল আইয়ুব খান নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্যতা সম্পর্কিত আদেশ এবডো (Elective Bodies Disqualification Order) ঘোষণা করেন। এর অধীনে সোহরাওয়ার্দী সহ ৭৮ জন রাজনৈতিক নেতা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অযোগ্য বলে ঘোষিত হন।

জেনারেল আইয়ুব খান তার ক্ষমতা দখলের এক বছরপুর্তি উপলক্ষে ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর মৌলিক গণতন্ত্র (বেসিক ডেমোক্রাসি) অধ্যাদেশ জারি করেন। ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রাদেশিক উপদেষ্টা পরিষদ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্র (বেসিক ডেমোক্রাসি) অধ্যাদেশ জারি করেন। ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রাদেশিক উপদেষ্টা পরিষদ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্রী সংস্থা গঠন করেন। এই অধ্যাদেশের অধীনে চার স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো প্রবর্তন করা হয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত অন্য সব নির্বাচন (দেশের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদ) পরোক্ষ পদ্ধতিতে একটি নির্বাচকমন্ডলী (Electoral College) কর্তৃক সম্পন্নের ব্যবস্থা করেন। এ আদেশে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে পূর্ব পাকিস্তানে ৪০ হাজার ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হবেন। পরের বছর ১১ জানুয়ারী উভয় পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে সেনাপতি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার সকল অবৈধ কার্যক্রমকে বৈধতা দানের জন্য প্রহসনের আয়োজন করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ঃ

রাষ্ট্রীয় ছাত্র আন্দোলন চলার সময় সামরিক শাসনের অধীনে জেনারেল আইয়ুব খান তার ক্ষমতা দখলকে বৈধতা দেওয়ার জন্য হঠাৎ করে ১৯৬২ সালের এপ্রিলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও ৭ মে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন ধার্য করেন। এ নির্বাচন ছিল দলবিহীন। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের অধিকাংশ সেনাপতি আইয়ুব খানের সমর্থক।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ঃ

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ ও ১৬ মে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মোট ১৩টি দল অংশগ্রহণ করে। দলগুলো হল জেনারেল আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগ। কাউন্সিল মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, কৃষক শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি। নির্বাচনের সরকারী ফলাফল অনুযায়ী আইয়ুব খানের সর্মথক কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রার্থীরা অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ঃ

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ঘোষণা করেন "এক ব্যক্তি, এক ভোট" নীতির ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। হঠাৎ করেই ১৯৭০ এর অক্টোবরে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। এছাড়া ১৯৭০ সালের ৩০শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া দেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি আইনগত কাঠামো জারী করেন।

ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়। পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যার কারণে ৫ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ঘুর্ণিঝড়ের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি এলাকায় ১৭ জানুয়ারী ১৯৭১ এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১৭] নির্বাচন পূর্ব প্রচারণায় শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে তার দলের ৬ দফা এবং ছাত্র সমাজের ১১ দফার উপর গণভোট বলে অভিহিত করেন।[১৮] ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের জনসংখ্যা অনুপাতে বিভিন্ন প্রদেশগুলোর জন্য আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

এ নির্বাচন ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির ২৩ বছর পর অনুষ্ঠিত দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ নির্বাচন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ওয়ালী) পিপলস পার্টি, মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল ও আরো বেশ কিছু রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬২ টি জাতীয় আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি পুরুষ আসনে জয় লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সারা পাকিস্তানের আসন সংখ্যা ছিল ৩০০টি পুরুষ ও ১৩টি নারী আসন। আওয়ামী লীগ ১৩টি নারী আসনের মধ্যে ৭টি নারী আসনও লাভ করে ফলে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা দাড়ায় (১৬০+৭=১৬৭)টি। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের একটি আসনও পায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮১টি আসনে জয়ী হয় ভূট্টোর নেতৃত্বাধীন পিপলস পার্টি। পিপলস পার্টিও পূর্ব পাকিস্তানে একটিও আসন পায়নি। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে সমগ্র পাকিস্তানে যে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ অর্জন করে এমন এক অভাবনীয় বিজয়...যা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায়নি।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ তথ্যপুঞ্জী ঃ

১. দেবাশিষ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান, কলকাতা, সেন্ট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টার প্রাইজ, জুন ১৯৯৪ পৃঃ ১৭৬

২. Chowdhury, G.W, "Democracy in Pakistan", p-11

৩. ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল: "বঙ্গীয় আইন সভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৯)

৪. প্রাগুক্ত, ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল, পৃষ্ঠা ২৯৯

৫. Banerjee. S.N. A Nation in the Making, (Calcutta 1925) p 85-86)

৬. Hussein, Shawkat Ara, "Politics and Society in Bengal"

৭. প্রাগুক্ত, ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল পৃ-৩০৩

৮. প্রাগুক্ত-ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল, পৃ-৩০৪

৯. আহমদ, আবুল মনসুর , "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" নওরোজ কিতাববিস্থান (ঢাকা-১৯৭০) পৃ-৫৫

১০. রশিদ, হারুন অর, "বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্বমুলক সরকারের ক্রম বিকাশ" (১৮৬১-২০০১) পৃ-৫৭

১১. প্রাগুক্ত-আহমদ, আবুল মনসুর, পৃ-৫৬

১২. প্রাগুক্ত, ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল পৃ-৩০৭

১৩. Jahan, Rounaq, "Bangladesh Politics: Problems and Issues" Dhaka: University press Ltd. 1980 p-IX

১৪. Richard L.Park and Richard S. Wheeler, "East Bengal Under Governor's Rule" For Eastern Survey, 23 (1954), 129

১৫. আহমেদ, কামাল উদ্দিন, 'চুয়ান্ন সালের নির্বাচন: স্বায়ত্বশাসন ১৭০৮-১৯৭১ এশিয়াটিক সোসাইটি' ১৯৯৩, পৃ-৪৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১৬. Chowdhury, G.W., ''Democracy in Pakistan'', (Dacca 1963) 56-57

১৭. হক, আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর, ১৯৯৫, পৃঃ ১-২

১৮. Holiday, 14 June, 1970

১৯. Maniruzzaman, Talukdar: "Redical Politics and Emergence of Bangladesh", Dhaka: Bangladesh Books International Ltd. 1975. p-41.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭২-১৯৯০)

বাঙালীদের ২৪ বছরের সংগ্রামের ফল স্বরূপ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। নতুন রাষ্ট্রের সূচনা লগ্নেই ১৯৭২ এর ১১ জানুয়ারী সাময়িক সংবিধান আদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রই ছিল মুখ্য। আর সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অংশ। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"[১] এখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ শাসন করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যাপারটি শাসনতান্ত্রিক ভাবেই এসেছে। তাই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১ সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৩

বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায়। ১৯৭৩ সালে ২৮৯ টি আসনে নির্বাচন হয়। বাকি আসনের প্রার্থীরা নির্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হয়ে সরকার গঠন করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৭৩

দল	মোট আসন প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত মোট
আওয়ামী লীগ	২৯২	২৯২ (৯৭.৫৮)	৭৩.২০	১৩৭৯৩৭১৭
ন্যাপ (মোজাফফর)	২২৪	০১ (০.৩৫)	৮.৩৩	১৫৬৯২৯৯
জাসদ	২৩৭	০১ (০.৩৫)	৬.৫২	১২২৯১১০
ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	০১ (০.৩৫)	৫.৩২	১০০২৭৭১
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	০৮	০১ (০.৩৫)	০.৩৩	৬২৩৫৪
বাংলা জাতীয় লীগ	১১	-	০.২৮	৫৩০৯৭
সিপিবি	০৪	-	০.২৫	৪৭২১১
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	০৩	-	০.২০	৩৮৪২১
কমিউনিস্ট পার্টি(লেলিনবাদী)	০২	-	০.১০	১৮৬১৯
বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	০৩	-	০.০৬	১১৯১১
বাংলা জাতীয় কংগ্রেস	০৩	-	০.০২	৩৭৬১
জাতীয় শ্রমিক দল	০১	-	০.০১	১৮১৮
স্বতন্ত্র	১২০	০৪ (১.৭৩)	৫.২৫	৯৮৯৮৮৪
মোট	১০৭৮	৩০০	১০০	১৮৮৪৬৮০৮

ব্রাকেটে প্রাপ্ত আসনের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন ১৯৭৩

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় কাঙ্ক্ষিত ছিল। শেখ মুজিবর রহমানের ব্যক্তিগত মর্যাদা ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে। তাঁর জনপ্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ করার মত কেউ ছিল না। অন্য দিকে বিরোধী দলগুলো বেতার, টেলিভিশন, পত্র পত্রিকায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। ভোটারদের জন্যে সত্যিকারের কোন বিকল্প ছিল না। তারা শেখ মুজিবর রহমানের কারিশমাকেই ভোট দিয়েছে। অন্যান্য দলেও বিশেষ করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে, নিবেদিত কর্মী অনেক আছেন কিন্তু জাতীয় পর্যায়ের নেতা বলতে কেউ নেই।[২] ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রধান মন্ত্রিত্বে ২১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যদের শতকরা ৪৩ ভাগ এর পূর্ব অভিজ্ঞতার কমতি ছিল।[৩] তারপরও তিনি দেশ গঠনে তৎপর ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের সূচনা হয়। এরপর চলতে থাকে একের পর এক অভ্যুত্থান, ব্যর্থ অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা স্বাধীন বাংলাদেশে নির্বাচন হয়ে পরে অনেকটা প্রহসন।

৩.২ সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৯

বাংলাদেশে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায়, আর দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায়।

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি সায়েম। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত জিয়াউর রহমান ছিলেন অন্যতম উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, যদিও কার্যত তিনিই ছিলেন প্রধান। ১৯৭৬ সালের ২৯শে নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ থেকে অব্যাহতি নেন এবং জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালে যখন রাষ্ট্রপতি সায়েম স্বাস্থ্যগত কারণে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করেন তখন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। জিয়া সরকার ১৯৭৬ সালের ২৮শে জুলাই এক নতুন রাজনৈতিক দল বিধি প্রণয়ন করেন এবং বিধি সাপেক্ষে রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক ক্রিয়ালাপের অনুমতি দেওয়া হয়।

১৯৭৮ সালের ৩ জুন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন ৬টি দলের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী। নির্বাচনের পর এই ফ্রন্টকে তিনি রাজনৈতিক দলে রূপান্তর করতে চান। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বয়ং এই দলের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী সামরিক শাসনের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক দল ও উপদল অংশ গ্রহণ করেন। নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২০৭টি আসন পায়। দলটি প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪১.১৭ ভাগ ভোট পায়। আওয়ামী লীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ঐ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। এক ভাগের নেতৃত্ব দেন আব্দুল মালেক উকিল ও অপর ভাগ মিজানুর রহমান চৌধুরী। নির্বাচনে মালেক গ্রুপ পায় ৩৯টি আসন (শতকরা ২৪ দশমিক ৫৬ ভাগ ভোট) আর মিজান গ্রুপ পান মাত্র ১টি আসন (শতকরা ২ দশমিক ৭৮ ভাগ ভোট)

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৯

দল	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট
বিএনপি	২৯৮	২০৭ (৬৯)	৪১.১৭	৭৯৩৪২৩৬
আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৫	৩৯ (১৩)	২৪.৫৬	৪৭৩৪২৭৭
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৪	২ (০.৬৬)	২.৭৮	৫৩৫৪২৬
মুসলিম লীগ আইডিএল	২৬৬	২০ (৬.৬৬)	১০.০৭	১৯৪১৩৯৪
জাসদ	২৪০	৮ (২.৬৬)	৪.৮৩	৯৩১৮৫১
ন্যাপ (মোজাফফর)	৮৯	১ (০.৩৩)	২.২৪	৪৩২৫১৪
বাংলাদেশ গণফ্রন্ট	৪৬	২ (০.৬৬)	০.৬০	১১৫৬২২
বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল	২০	১ (০.৩৩)	০.৩৯	৭৪৭৭১
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১৩	২ (০.৬৬)	০.৩৬	৬৯৩১৯
বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি	৫	১ (০.৩৩)	০.১৮	৩৪২৫৯)
জাতীয় একতা পার্টি	৫	১ (০.৩৩)	০.২৩	৪৪৪৫৯
স্বতন্ত্র	৪.২২	১৬ (৫.৩৩)	১০.১৯	১৯৫৩৩৪৫

ব্রাকেটে প্রাপ্ত আসনের শতকরা হার দেখা হয়েছে।

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন, দেখুন, Al Masud Hassanuzzaman, 'Role of Opposition in Bangladesh Politics', Dhaka, 1998.

১৯৮১ সালের ৩০মে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কতিপয় বিদ্রোহী অফিসার কর্তৃক প্রেসিডেন্ট লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিহত হন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৮৬

২৪মার্চ ১৯৮২, রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন।[৪] ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীকে তিনি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন। সংবিধান স্থগিত, সংসদ বাতিল ও মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। অভ্যুত্থানের সময় থেকেই জেনারেল এরশাদের লক্ষ্য ছিল যে কোন উপায়েই হোক রাষ্ট্রপ্রধান পদে নির্বাচিত হওয়া।[৫] এ উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ সালের শেষে তিনি 'জনদল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। কিন্তু তিনি নিজে এ দলে যোগ দেননি। পরবর্তীতে এ দলই হয় জাতীয় পার্টি এবং তিনি এ দলে যোগ দেন। জেনারেল এরশাদ ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে উপজেলাগুলাতে নির্বাচন করেন। জেলাগুলোতে একজন করে গভর্নর নিয়োগ দেন। সংসদ নির্বাচন করার আগে উপজেলা নির্বাচন করায় সকলেই হতাশ হয়েছিলেন।

১৯৮৬ সালের ৭ই মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন হল। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে নবগঠিত জাতীয় পার্টি ছাড়া অন্য সবগুলা দল নির্বাচন বর্জন করার ব্যাপারে মোটামুটি একমত ছিল। ১৯শে এপ্রিল সে মর্মে তারা আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও দেয়। কিন্তু ২১শে এপ্রিল আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে যে তারা সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে।[৬] বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট ও ৫ দলীয় বাম জোট এ নির্বাচন বয়কট করে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি পেয়েছিল ১৫৩ টি আসন, প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪২ দশমিক ৩৪ ভাগ ভোট। অন্য দিকে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৭৬টি আসন। ভোট পেয়েছিল ২৬.১৬ ভাগ। এর বাইরে জামায়াত ১০টি, সিপিবি ৫টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ২টি, ন্যাপ (ভাসানী) ৫টি, বাকশাল ৩টি, জাসদ (রব) ৪টি, জাসদ (সিরাজ) ৩টি, মুসলীম লীগ ৪টি, ওয়াকার্স পার্টি ৩টি ও স্বতন্ত্ররা ৩২টি আসন পেয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, (১৯৮৬)

দল	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত আসনের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোটেরশতকরা হার
জাতীয় পার্টি	১৫৩	৫১.০১	৪২.৩৪
আওয়ামী লীগ	৭৬	২৬.১৫	২৬.১৬
জামায়াতে ইসলামী	১০	৩.৩৩	৪.৬৯
ন্যাপ (যুক্ত)	৫	১.৬৬	১.২৯
ডসপিবি	৫	১.৬৬	০.৯১
জাসদ (রব)	৪	১.৩৩	২.৫৪
মুসলিম লীগ	৪	১.৩৩	১.৪৫
জাসদ (সিরাজ)	৩	১.০০	০.৮৭
বাকশাল	৩	১.০০	০.৬৭
ওয়াকার্স পার্টি	৩	১.০০	০.৫৩
ন্যাপ (মোজাফফর)	২	০.৬৬	০.৭১
অন্যান্য	-	-	১.৭৩
স্বতন্ত্র	৩২	১০.৬৬	১৬১৯
মোট	৩০০	১০০.০০	১০০.০০

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন, ১৯৮৬

লর্ড ডেভিড এনালসের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বৃটিশ পর্যবেক্ষক দল ১৯৮৬ সালের মে মাসের সংসদ নির্বাচন দেখতে গিয়েছিলেন। সে নির্বাচনে ব্যাপক, সহিংসতা, ভীতি প্রদর্শন, জাল ভোট প্রদান, ব্যালট বাক্স চুরি ইত্যাদি বহু দুর্নীতি হয়েছে বলে সে পর্যবেক্ষক দল অভিযোগ করেন।[৭] এ নির্বাচন ছিল ভোটারবিহীন নির্বাচন। দেশি, বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনে ব্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

[illegible] করেন এবং এর জন্য [illegible] হয় [illegible] ১১ জন নিহত ও [illegible] জন [illegible]

১২ জুন ১৯৮৬ [illegible] সংসদ [illegible] ১০ জুলাই নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন [illegible] শেখ হাসিনা [illegible] সংসদের [illegible] ৮ দল, [illegible] ও ৭ দল [illegible] অধিবেশনকে [illegible] ঘোষণা করে এবং শেখ হাসিনা [illegible]

৩.৪ সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৮৮

১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর থেকে রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে [illegible] এরশাদ সরকারের [illegible] এবং সরকারের [illegible] বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা [illegible] ১৯৮৭ সালের ২৭ নভেম্বর [illegible] জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন [illegible] রাজনৈতিক [illegible] বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা [illegible] রাজনৈতিক [illegible] বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা [illegible] ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে [illegible] ও বর্জন [illegible] হয়

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৯৮

দল	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	২৮০	২৫১	৮৩.৬৬
কপ*	২৬৮	১৯	৬.৩৩
জাসদ (সিরাজ)	২৪	৩	১.০০
ফ্রিডম পার্টি	১১১	২	০.৬৬
অন্যান্য দল	৫৯	০	০
স্বতন্ত্র	২১৩	২৫	৮.৩৩
মোট	৯৫৫	৩০০	১০০.০০

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন *কপ বা Combined Opposition Parties.

বিরোধী দলের মনোভাব জেনেও জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষণা অনুযায়ী ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন ১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করে। আন্দোলনরত সকল জোট ও দল এই ঘোষাণা প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্বাচন বাতিলের ডাক দেয়। এরশাদ আগের মত প্রসহনমূলক নির্বাচনের দিকে ধাবিত হয়। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ নির্ধারন করে। পাশাপাশি ১৯৮৮ সালের ২৫ জানুয়ারী সরকার এক নতুন আদেশ জারির মাধ্যমে সকল প্রকার নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ করে। এরশাদ পুনরায় আরেকটি ভোটার এবং প্রতিযোগীতাবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন সম্পন্ন করে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ঐ নির্বাচন বয়কট করে। এ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি ও জেনারেল এরশাদ সমর্থক কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ) ও ফ্রিডম পার্টিসহ ৮টি দল অংশ গ্রহণ করে। মুলত এসব দলকে নানা ধরনের সুবিধা দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানো হয়। প্রহসনের এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি তিন চতুর্থাংশেরও বেশী আসনে জয় লাভ করে বলে সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়। বিরোধী দল এ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫ তথ্যপুঞ্জী ঃ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত পৃ-৪

২. রহমান, সিরাজুর; ইতিহাস কথা কয় ও নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, পৃ-৩১, শিকড়, ২০০২)

৩. Banu, U.A.B. Razia Akter, ‘‘The Fall of Sheikh Mujib Regime An Analysis.” The Indian Political Science Review. Vol –XV, N0-1 January 1981 p-9

৪. Westergeard, Kirsten; “State and Rural Society in Bangladesh”. Select Book Services Ltd. New Delhi, 1986, p-100; আশরাফ কায়সার; বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ-১১০

৫. রহমান, সিরাজুর; ইতিহাস কথা কয় ও নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, পৃ-১১৬

৬. প্রাগুক্ত, রহমান, সিরাজুর, পৃ-১৬৬

৭. প্রাগুক্ত, রহমান, সিরাজুর পৃ-১১৭

৮. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৬ মে, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন

৪.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক প্রকারের শাসন ব্যবস্থা, যেখানে দুইটি নির্বাচিত সরকারের মধ্যবর্তী সময় কালে সাময়িক ভাবে অনির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ কোন দেশের শাসনভার গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ একটি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় থেকে নতুন একটি সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ববর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত থাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এ সরকার দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে এবং নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে। সাধারণত নির্বাচন পরিচালনাই এ সরকারের প্রধান কাজ।

৪.২ তিন জোটের রূপরেখা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ

১৯৮১ সাল থেকে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। ৯০-এর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ১৫-৭-৫ দলের সমন্বয়ে গঠিত তিন জোটের নেতৃত্বে একটি গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। এ আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনের তিন জোটের যে ঐতিহাসিক রূপরেখা প্রণীত হয়েছিল সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা পাওয়া যায়। তিন জোটের রূপরেখায় ১০টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলো বিভক্ত ছিল চারটি ভাগে। প্রতিশ্রুতিগুলো হলো ঃ[১]

(১) হত্যা, কুচক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তার সরকারের শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ঃ

(ক) সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে এরশাদ ও তার সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত তিন জোটের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করবেন। বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে উক্ত উপরাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

(খ) এই পদ্ধতিতে উক্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, যার মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

(২) (ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সাথে যুক্ত হবেন না।

(খ) অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করবেন।

(গ) ভোটারগণ যাতে করে নিজ ইচ্ছা ও বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(ঘ) গণপ্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দী সকল রাজনৈতিক দলের প্রচার প্রচারণার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট অর্ন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং এই সংসদের নিকট সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

(৪) (ক) জনগণের স্বার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশে সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হবে। অসাংবিধানিক যে কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে। নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভূত কোন পন্থায়, কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।

(খ) জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করা হবে।

৪.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ১৯৯১ এর নির্বাচন ঃ

প্রেসিডেন্ট এরশাদের নয় বছর স্থায়ী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে টানা আন্দোলনের শেষভাগে সারা দেশ হরতাল, বিক্ষোভ, প্রতিরোধ আর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। এরশাদ সরকারও এই আন্দোলন দমনের জন্য সব রকম চেষ্টা চালায় এবং অনিবার্য রক্তপাত ঘটতে থাকে দেশজুড়ে। এই অবস্থায় শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি ফর্মূলা নির্ধারণ করে তিন জোট একটি রূপরেখা ঘোষণা করে। তিন জোটের তত্ত্বধায়ক সরকারের রূপরেখা নামের এই ঘোষণাটি দেওয়া হয় ১৯৯০ সালের ১৮ নভেম্বর।[২] এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর পদত্যাগ ও তিন জোটের মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। তিন জোটের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এই সরকারের অধীনে ৯১-এর ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১৪৬টি বেশি আসন পেয়ে জামায়াতের সমর্থনে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জন করে। মার্চে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে এবং রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৫ মার্চ তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ বিলোপ ঘোষণা করেন।[৩]

বহু আকাঙ্ক্ষিত এ নির্বাচন যুগপৎ জনগণ ও রাজনৈতিক দল সমূহর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং এ নির্বাচনেই পূর্ববর্তী অন্যান্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে।[৪] সারা দেশের ২৪ হাজার ২শ ভোট কেন্দ্রের মধ্যে নির্বাচন কমিশন, প্রিসাইডিং অফিসারদের নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত হওয়ার কারণে চারটি আসনের ২১টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। বিক্ষিপ্ত নির্বাচনী সংঘর্ষে সারা দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্মথক ও কর্মী আহত এবং গ্রেফতার হয়েছে।[৫]

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী পর্যবেক্ষক দল ১৯৯১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসেন। এ সকল পর্যবেক্ষকগণ এ নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অত্যন্ত সকল বলে স্বীকৃতি দেন।[৬] যে

Dhaka University Institutional Repository

সকল কারণে নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে সরকারি দলের অনুপস্থিতি, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, নির্বাচন কমিশনের স্বায়ত্বশাসন ও প্রচুর ক্ষমতা প্রাপ্তি ছিল উল্লেখযোগ্য।[৭] জনগণ আশা করেছিল সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গণতন্ত্রকে লালন পালন করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে। কিন্তু ১৯৯১ পরবর্তী নির্বাচিত সরকার তিন জোটের পক্ষ থেকে যে অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণা করা হয় তার ব্যাপারে মনোযোগ দেয়নি। এটি সুস্পষ্ট যে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার গণদাবির কাছে নতি স্বীকার করেছে এবং তিন দলীয় জোটের সব দাবি মেনে নিয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারও কথা রেখেছিল। কিন্তু পরবর্তী নির্বাচিত সরকারগুলো কি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল?[৮]

৪.৪ সাংবিধানিক প্রথম তত্ত্বধায়ক সরকার ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ও ১২ জুন, ১৯৯৬ এর নির্বাচন

বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত ১৯৯৬ সালের সরকার হচ্ছে সাংবিধানিকভাবে প্রথম তত্ত্বধায়ক সরকার। আর ঐতিহাসিকভাবে সে ক্ষেত্রে প্রথম হওয়ার দাবিদার ১৯৯০ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত সরকার। এটি গঠিত হয় এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তিন জোটের রূপরেখা অনুসারে। দুই তত্ত্বাবধায়ক সরকারই গঠিত হয় সুদীর্ঘ এবং রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সবচেয়ে বেশী আসন পেয়ে সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ আনেন।তবে তিনি এ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন। সেই থেকে পঞ্চম সংসদের যাত্রা শুরু। বিএনপি সরকার গঠন করার কিছু দিন পর থেকেই বিরোধী দলগুলো সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংযোজনের জন্য সরকারকে চাপ দিতে থাকে।[৯]

১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে বিএনপি সরকারের আমলে প্রথম উপনির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা-১১ আসনে। এতে সরকারি দল জয়ী হয়। ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগ ১৬ কেন্দ্রের

Dhaka University Institutional Repository

পুনঃনির্বাচন দাবি করে। কারচুপির প্রতিবাদে তারা ৬ ফেব্রুয়ারী সারা দেশে হরতাল পালন করে।[১০] রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সূচনা এখানেই। মাগুরা-২ আসনের সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আসাদুজ্জামান মারা যাওয়াতে ঐ সময়ে সেখানে চলছিল উপনির্বাচনের কর্মকান্ড। উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ২০ মার্চ সেখানে উপনির্বাচন হয়। গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদর উপস্থিতিতেই ভোট জালিয়াতি, ভোট ডাকাতি এবং সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করা হলো। আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা থাকলেও বিএনপি প্রার্থী কাজী সলিমুল হক কামালকে ঐ দিনই বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এরই প্রেক্ষাপটে শুরু হল লাগাতার সংসদ অধিবেশন বর্জন ও অন্য দিকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবিতে আন্দোলন।

১৯৯৪ সালের ২৭ জুন সংসদ ভবনে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ, জামায়াত তত্ত্বধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে। ১৯৯৪ সালের ১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মানিক মিয়া এভিনিউতে এক জনসভায় ঘোষণা করেন, বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি অসাংবিধানিক। ৫ অক্টোবর ঝালকাঠিতে এক জনসভায় তিনি বলেন, তত্ত্বধায়ক সরকারের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনে অজস্র হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও, মিছিল, সমাবেশ, পদযাত্রা, রেলযাত্রা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব কর্মসূচী অনেক ক্ষেত্রেই সহিংস ও রক্তক্ষয়ী ছিল। কমনওয়েলথ মহাসচিব সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর নভেম্বরে কমনওয়েলথ মহাসচিবের প্রতিনিধি স্যার নিনিয়ান সমঝোতা প্রচেষ্টা চালান। তিনিও ব্যর্থ হন।[১১] ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৪ আওয়ামী লীগ, জামায়াত আলাদা সমাবেশ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেয়। সরকার তার অবস্থানে অনড় থাকায় ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ পত্র পেশ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারী স্পিকার তাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণযোগ্য নয় বলে রুলিং দেন। ১৯৯৫ সালের ১৯ জুন বিরোধী সংসদ সদস্যদের পর পর ৯০ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিতি পূর্ণ হয়। এতে সংসদে তাদের আসন শূণ্য হবে কিনা এ নিয়ে বিতর্কে সরকারি

Dhaka University Institutional Repository

দল ও স্পিকারের মাঝে দ্বিমত দেখা দেয়। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক পদত্যাগী সংসদ সদস্যদের আসন শূণ্য হবে কিনা জানতে চেয়ে সুপ্রীম কোর্টের নিকট পরামর্শ চান। সুপ্রীম কোর্ট পদত্যাগী সংসদ সদস্যদের আসন শূণ্য হওয়ার পক্ষে মত দেন। ৩১ জুলাই ১৯৯৫ সংসদ সচিবালয় থেকে ৮৭ জন বিরোধী সংসদ সদস্যের আসন শূণ্য বলে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া যে ৫৫ জন বয়কটকালে হাজিরা খাতায় সই করেছিলেন তাদের সংসদ সচিবালয় থেকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়, সেদিন তারা হাজিরা খাতায় সই করেছিলেন সেদিন বৈঠকে তারা উপস্থিত ছিলেন কিনা। সংসদ সদস্যরা এ চিঠির কোন উত্তর দেননি। অবশেষে ৭ আগস্ট ঐ ৫৫ জনের আসনও শূণ্য ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন কমিশন ১৪২টি আসনে ১৭ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন ঘোষণা দেয়। বন্যার কারণে উপনির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ১৫ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়। কিন্তু বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। তারা সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২ সেপ্টেম্বর থেকে টানা ৩২ ঘন্টা হরতাল পালন করে। ৬ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনা আবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন।[১২] তত্ত্বধায়ক সরকারের দাবি প্রধানমন্ত্রী অসাংবিধানিক অযৌক্তিক বলে বাতিল করে দেন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলোকে আলোচনার জন্য ডাকেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলো আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। এরপর ১৬ নভেম্বর ১৯৯৫ থেকে একধারে ৭ দিন হরতাল পালিত হয়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেখা দেয় এক বিপর্যয়। শুধুমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারকে কেন্দ্র করে এ অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। হরতাল অবরোধের ফলে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বেশ দূরবস্থার মুখোমুখি হয়। সরকার উপনির্বাচনে না গিয়ে ২৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। ১৮ জানুয়ারী ১৯৯৬ সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। পরে তৃতীয়বারের মত তারিখ পরিবর্তন করে নতুন তারিখ হয় ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী।

নির্বাচন ব্যবস্থার উপর আস্থা না থাকা ও সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সব বিরোধী দল এ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধের মুখে ১৫ ফেব্রুয়ারী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী সহিংসতায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়। সমগ্র দেশ

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হয়। ২৪, ২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারী বিরোধী দলের আহ্বানে দেশব্যাপী অসহযোগ পালিত হয়। ৬ মার্চ হরতালের মধ্যে সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সহিংসতায় ৯ জন নিহত হয়।

বিরোধী দলগুলোর লাগাতার অসহযোগ আন্দোলনের মাঝেই ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। সারাদেশে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। এর মধ্যে আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। ফলে আন্দোলন এক নতুন মাত্রা লাভ করে। সরকার ২১ মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে উত্থাপন করে। ২৬ মার্চ সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল জাতীয় সংসদে পাশ হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরার্মশক্রমে ৩০ মার্চ রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ সংসদ ভেঙ্গে দেয় এবং বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশঃ

১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। কিন্তু সারা দেশে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। সরকার ২১ মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে উত্থাপন করে। ২৬ মার্চ সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল জাতীয় সংসদে পাশ হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ৩০ মার্চ রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ সংসদ ভেঙ্গে দেয় এবং খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি, সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন ১৯৯৬ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবলিত বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন ২৬৮-০ ভোটে পাশ হয়। ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর এটি আইনে পরিণত হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে চতুর্থ "২ক পরিচ্ছদ;

Dhaka University Institutional Repository

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার" নামে নতুন পরিচ্ছেদ যোগ হয়। এতে ৫৮ক, ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ ও ৫৮ঙ নামে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়। এছাড়া সংবিধানের ৬১, ৯৯, ১২৩, ১৫৭, ১৫২ অনুচ্ছেদসহ তৃতীয় তফসিলের বিধান সংশোধন করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান মুহম্মদ হাবিবুর রহমান তাঁর উপদেষ্টা পরিষদকে নিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সচেষ্ট হন। দেশে কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মোট ১৪৭টি আসনে জয়লাভ করে জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। বিএনপি মোট ১১৬টি আসন পেয়ে বৃহৎ বিরোধী দলের রেকর্ড অর্জন করে।

বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারকে কেন্দ্র করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান হয়। তার পরও নির্বাচনী বিরোধ রয়েই যায়। বাংলাদেশের মানুষ একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জন্য আশায় থাকে।

৪.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ২০০১ সালের নির্বাচনঃ

১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং জাতীয় ঐক্যমতে সরকার গঠন করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকারের মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হয় ১৬ জুলাই ২০০১ এবং ১৪ জুলাই রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেন। সংবিধানের ৫৮ (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোঃ লতিফুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। উদ্দেশ্য বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি ১৬ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। উপদেষ্টা পরিষদের শপথ গ্রহণের ১ ঘন্টার মধ্যে ১৩ জন সচিবকে বদলির নির্দেশ দেন।[১৩] তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনপ্রশাসনের নিরপেক্ষতা অর্জনের জন্য ২৮ জন সচিব, ১৯ জন অতিরিক্ত সচিব, ৪৫ জন যুগ্ম সচিব, ৭৭ জন উপ-সচিব, ৫৬ জন সহকারি সচিব এবং ৪৬৪ ওসিকে বদলি করে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সরকার নির্বাচনী আইন সংশোধন করে। সংশোধিত জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০১ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী বিধি প্রণয়নের জন্য ক্ষমতা দেয়া হয়। এ অধ্যাদেশে নির্বাচনী কারচুপি সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির দায়িত্ব নির্বাচন ট্রাইবুনালের পরিবর্তে হাইকোর্ট বিভাগের অধীন করা হয়।[১৫] তত্ত্বাবধায়ক সরকার সারা দেশে পুলিশ, বিডিআর-এর সহযোগীতায় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালায়। ২৮ জুলাই ২০০১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত মোট ৫,৪৮১টি অস্ত্র উদ্ধার করে এবং ১২৪২২০ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করে।[১৬] নির্বাচনের পূর্বে, অবস্থা বিবেচনা করে সরকার সারাদেশে মোট ১৩০০০ ভোট কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এস.এ সাঈদ ২০০১ সালের ১ অক্টোবর সোমবার অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন। ঘোষণা অনুযায়ী কক্সবাজারে একটি আসনের একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ৩০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের মধ্যে ২৯৯টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মোট ৫৪টি দল থেকে স্বতন্ত্রসহ মোট ১৯৩৯ জন প্রার্থী অংশ গ্রহণ করেন। বিএনপি জামায়াতে ইসলাম, জাতীয় পার্টি (নাজিউর-ফিরোজ) ও ইসলামী ঐক্যজোট এই চারদল জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করে। আওয়ামী লীগ ৩০০ আসেনই প্রার্থী প্রদান করে। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নামে জোট বদ্ধভাবে নির্বাচন করে।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী অষ্টম সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়াম লীগ ৪০.১৩% ভোট পায় কিন্তু আসন পায় ৬২টি। অপর পক্ষে বিএনপির ৪০.৯৭% ভোট পেয়ে আসন পায় ১৯৩টি। জামায়াতে ইসলামী ভোট পায় ৪.২৮% আসন পায় ১৭টি। জাতীয় পার্টি (না-ফি) ভোট পায় ১.১২% আসন পায় ৪টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট ভোট পায় ০.৬৮ আসন পায় ২টি। বিএনপি জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (না-ফি) ও ইসলামী ঐক্যজোট ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করে। তাই তারা মোট ২১৬টি আসন লাভ করে। এরশাদের জোট ৭.২৫% ভোট পেয়ে ১৪টি

Dhaka University Institutional Repository

আসন লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফল অনুসারে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও চারদলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ১০ অক্টোবর, ২০০১ সালে ষাট সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি করে। আওয়ামী লীগের দাবি, বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব ছিল অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কিন্তু তাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যর্থ হয়েছে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নিয়েছেন এবং সংসদ কার্যক্রম অংশ গ্রহণ করেছেন।

৪.৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৬-২০০৮ঃ

অষ্টম জাতীয় সংসদ পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি ছিল অনেক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সময়। ২০০৫ সালের ১৫ জুলাই আওয়ামী লীগ সহ ১৪ দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের জন্য ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করে। সংস্কার প্রস্তাবের মূল দাবিগুলো ছিল-

রাষ্ট্রপতি সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যদের নিয়োগ দান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালীন প্রতিরক্ষা বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যাস্তকরণ, নির্বাচন কমিশন সংস্কার, স্বচ্ছ ব্যালট বক্স ও গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন।[১৭] সংবিধানের ৫৮গ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে.এম হাসান প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের কথা। কিন্তু আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল তার বিরুদ্ধে অষ্টম সংসদ চলাকালীন সময় থেকে আপত্তি জানায়। ক্ষমতায় থাকা জোট সরকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী দ্বারা বিচারপতিদের অবসরের বয়স বৃদ্ধি করে। ফলে বিচারপতি হাসান হবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। কিন্তু আওয়ামী লীগ সহ ১৪ দল বিচারপতি হাসানের প্রতি আপত্তি জানায়। ২৭ অক্টোবর ২০০৬ অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তি বিচারপতি হাসানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ঠেকাতে ১৪ দল দেশব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমর্থকদের মধ্যে সংর্ঘষ ছড়িয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি হাসানের শপথ গ্রহণের বিষয়টি ঝুলে থাকে। ২৮ অক্টোবর বিচারপতি কে.এম হাসান আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপির মহাসচিবকে সমঝোতায় আসার জন্য বঙ্গভবনে আলোচনার আহ্বান করেন। কিন্তু কোন ঐক্যমতে না আসায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৫৮গ(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৯ অক্টোবর রাত ৮টায় নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সহ ১৪ দল সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অন্য দলের কোন নেতা বা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।[১৮] তখন রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ ৩১ অক্টোবর ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ ও শপথ পাঠ করান। রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণকে সকল দল থেকে মেনে নেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা একে অসাংবিধানিক বলে ব্যক্ত করেন। ওয়ার্কাস পার্টির রাশেদ খান মেনন রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহনকে "সাংবিধানিক ক্যু" বলে আখ্যায়িত করেন।[১৯] রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ ও একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে তিনটি রিট আবেদন করা হয়। অর্থাৎ ইয়াজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

বিরোধী দলের প্রথম ও প্রধান দাবি ছিল নির্বাচন কমিশনের সংস্কার। প্রধান নির্বাচন কমিশনের এম.এ আজিজের পদত্যাগের দাবীতে ১৪ দলীয় জোট ১২ নভেম্বর ২০০৬ থেকে লাগাতার চার দিনের অবরোধ পালন করে। লাগাতার আন্দোলনের মুখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বিচারপতি এম.এ আজিজ শেষ পর্যন্ত ছুটিতে যেতে বাধ্য হলেন।[২০] নির্বাচন কমিশন দফায় দফায় পরিবর্তন এনে পাঁচবার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে। সর্বশেষ ২২ জানুয়ারী ২০০৭ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। জোট বদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করণের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ "প্যাকেজ প্রস্তাব" গ্রহণ করে। ৯ ডিসেম্বর, ২০০৭ রাষ্ট্রপতি উপদেষ্টা পরিষদের সাথে কোন আলোচনা ছাড়াই আকস্মিকভাবে সারাদেশে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করেন। প্যাকেজ প্রস্তাব বাস্তবায়ন ও সেনা মোতায়েন নিয়ে বিরোধের কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৪ জন

Dhaka University Institutional Repository

উপদেষ্টা ১১ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন।[২১] হরতাল অবরোধ ও ঘেরাও কর্মসূচীর কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, ঘটতে থাকে প্রাণহানি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিন দিন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জনগণও আর এ অবস্থাকে মেন নিতে পারছিল না। দরিদ্র দেশের অর্থনীতি অচল হয়ে পড়ে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করে এবং নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। মহাজোট ৭ জানুয়ারী থেকে ২৭ ঘন্টা দেশব্যাপী টানা অবরোধ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারী থেকে লাগাতার বঙ্গভবন ঘেরাও ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮ জানুয়ারী সারাদেশে অবরোধ, ২১ ও ২২ জানুয়ারী হরতাল, নির্বাচন হলে ২৩ জানুয়ারী থেকে লাগাতার হরতাল কর্মসূচী ঘোষণা করে।[২২]

মহাজোট নির্বাচন বর্জন এবং লাগাতার হরতাল অবরোধ কর্মসূচী, বিদেশী পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণ মিশন তুলে নেয়া, উপদেষ্টাদের পদত্যাগ সারা দেশে সহিংসতা ইত্যাদি বিষয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা ও কার্যক্রমকে প্রশ্নে সম্মুখীন করে। এরূপ এক আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ ১১ জানুয়ারি ২০০৭ সন্ধ্যায় ঢাকাসহ সারাদেশে কারফিউ জারি করেন এবং প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দেন।[২৩] ১২ জানুয়ারি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গর্ভনর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। পরবর্তীতে তিন পর্যায়ে পুনর্গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ উপদেষ্টা নিয়োগ লাভ করেন এবং শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মহাজোট নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করলেও চারদলীয় জোট নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন নি। পূর্বতন সকল নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করেন এবং ড. এ.টি.এম শামসুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়। ভোটার তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে ছবিযুক্ত ভোটার ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। হাইকোর্ট ২৭ মার্চ ২০০৭ তারিখে ২২ জানুয়ারী নির্বাচনের জন্য তৈরী ভোটার তালিকা বাতিল ঘোষণা করে এবং একই সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ আলাদা করার সুপারিশ করে। সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোকে অভ্যন্তরীন গণতান্ত্রিক সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং নির্বাচনী

Dhaka University Institutional Repository

আচরণবিধি প্রণয়ন করে। সরকার ঘোষণা করে বিধিবদ্ধ ও রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশনের জন্য দলগুলোকে তৃণমূল পর্যায় থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা আর্থিক আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা এবং অভ্যন্তরীন গণতান্ত্রিক সংস্কারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক উদ্যোগগুলো, বিশেষ করে দ্রুত বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), সরকারি কর্মকমিশন পুণর্গঠন, দুর্নীতি বিরোধী অভিযান সহ বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কর্মসূচীতে মানুষ উৎসাহী হয়। কিন্তু জমি উদ্ধারের নামে সারা দেশে হাট-বাজার ভাঙ্গা, হকার ও বস্তি উচ্ছেদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। খাদ্য ও পণ্যের দাম আগের যেকোন সময়ের তুলনায় অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু রাজনৈতিক সংস্কারের চিন্তা ও পদক্ষেপে রাজনৈতিক ও সচেতন মহলে নানামুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে দুই নেত্রীকে দেশের বাইরে পাঠানো ও তাঁদের রাজনীতি থেকে বিরত রাখার চেষ্টা, বড় দলগুলোর ভেতরে সংস্কারের নামে বিভেদ সৃষ্টি, নতুন দলগঠন প্রভৃতি বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হয়নি। বড় দুই শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মামলা ও তাঁদের বিচারের সম্মুখীন করার উদ্যোগ; সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সমালোচনার ক্ষেত্র তৈরী করে। এক পর্যায়ে ২০০৮ সালের মে মাসের শেখ হাসিনা নির্বাহী আদেশে ও আগস্ট মাসে বেগম জিয়া আইনী প্রক্রিয়ায় মুক্তিপান। দুর্নীতির অভিযোগে যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন তারা জামিন পান। এটা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া কোন পরিবর্তন ও সংস্কার সফল হয়না। সরকার ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তারিখ ঠিক করে। সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সরকার যতদূর সম্ভব নমনীয় হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ ২০০৮ সালের নির্বাচন ঃ

অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৯৯ টি আসনের বিপরীতে ১,৫৫৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৩৭ টি রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ৮,১১,৩০,৯৭৩ জন ভোটার ভোট প্রদান করেন যার মধ্যে ৪,১২,৪৪,৮২০ জনই মহিলা। প্রায় ১,৮১,০০০ জন দেশী এবং ৫০০ জন বিদেশী পর্যবেক্ষক এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বে মহাজোট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে, মন্ত্রিসভা গঠন করে।

জোট	দল	ভোট	%	আসন
মহাজোট	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩৮৮৭৪৫১	৪৯.০%	২৩০
	জাতীয় পার্টি	৪৮৬৭৩৭৭	৭.০%	২৭
	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৪২৯৭৭৩	০.৬%	৩
	ওয়ার্কাস পার্টি	২১৪৪৪০	০.৩%	২
	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১৬১৩৭২	০.২%	১
চারদলীয় জোট	বি এন পি	২২৯৬৩৮৩৬	৩৩.২%	৩০
	জামাত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ	৩১৮৬৩৮৪	৪.৬%	২
	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	৯৫১৫৮	০.১%	১
	ইসলামী ঐক্যজোট	-	-	-
স্বতন্ত্র		৩৩৬৬৮৫৮	৪.৯%	৪
মোট		৬৯১৭২৬৪৯	৯৯.৯৯%	৩০০

উৎসঃ নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সদস্যদের যোগ্যতা ও কার্যাবলী ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংশোধনী অনুযায়ী দু'ভাগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়

১. কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হলে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ১৫ দিনের মধ্যে।

২. মেয়াদ অবসানের কারণ- সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনঃ

৫৮গ অনুচ্ছেদ অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১১ সদস্যের বেশি হবে না। এর মধ্যে একজন প্রধান উপদেষ্টা ১০ উপদেষ্টা থাকবেন।

উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতা:

১. সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

২. তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোন সংগঠনের সদস্য হবেন না।

৩. আসন্ন সংসদ নির্বাচন প্রার্থী নহেন বা প্রার্থী হবেন না এ মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হয়েছেন।

৪. ৭২ বছরের অধিক বয়স্ক নহেন।

প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে যাকে নিয়োগ দেয়া যাবে-

১. বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন।

২. যদি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি যদি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান তাহলে তার অব্যাবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে।

৩. যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি যদি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মতি জানান তাহলে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন।

৪. যদি আপিল বিভাগের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ নিতে অসম্মতি জানান তাহলে প্রেসিডেন্ট প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে কোনো ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দেবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫. উপরোক্ত কাউকে না পাওয়া গেলে প্রেসিডেন্ট তার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

পদমর্যাদা ও কার্যবালী:

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

কার্যাবলী ঃ

১. দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন ছাড়া তত্ত্ববধায়ক সরকার কোনো নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না।

২. শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এই সরকার নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সাহায্য করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯ তথ্যপুঞ্জী ঃ

১. বদিউল আলম মজুমদার, নব্বইয়ের অঙ্গীকার বরখেলাপের পরিনাম, প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর ২০০৭

২. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, নভেম্বর-১৯৯০

৩. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ১৬ মার্চ-১৯৯১

৪. দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

৫. ইনকিলাব, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

৬. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, দুর্নীতির স্বরূপ অন্বেষণ ঃ বাংলাদেশ নিবেদন প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯১, পৃ-১৪৬

৭. প্রাগুক্ত, মুহম্মদ ইয়াহ্ইয়া, পৃ-১৪৭

৮. প্রাগুক্ত, বদিউল আলম, প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর, ২০০৭

৯. দৈনিক যায়যায় দিন, নভেম্বর ৬, ২০০৬

১০. দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

১১. দৈনিক যায়যায় দিন, ৬ নভেম্বর ২০০৬

১২. দৈনিক যায়যায় দিন, ৬ নভেম্বর ২০০৬

১৩. The CCHRB Election Observation Report: The Eight Parliamentary Election 2001. p-16-17

১৪. Akther, Yeahia, Mohammad, Election Corruption in Bangladesh, Ashate, 2000, p-150

১৫. Ibid, P-30

১৬. Ibid, P-17

১৭. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১৬ জুলাই, ২০০৫

১৮. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা-৩০ অক্টোবর, ২০০৬

১৯. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬

২০. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২৩ নভেম্বর ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

২১. আকবর আলী খান, লে.জে. অবঃ হাসান মশহুদ চৌধূরী, সি.এম. শফি সামি ও সুলতানা কামাল পদত্যাগ করেন

২২. যুগান্তর, ঢাকা-১১ জানুয়ারী ২০০৭

২৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১২ জানুয়ারী ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের নির্বাচনের সমস্যাবলী

নির্বাচন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অংশ। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত হইবে।"[১]

কিন্তু বাংলাদেশ এমনই একটি নিত্য অঘটন সম্ভব দেশ যে, এর রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সাংবিধানিক পালনীয়গুলোর মিল থাকে না অনেক সময়ই। সংবিধানে আছে এক কথা আর বাস্তবে ঘটে অন্য। সংবিধানে ছিল গণতন্ত্র হবে দেশটির রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু দীর্ঘ দিন দেশে চলেছে সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন। বাংলাদেশের মানুষ সর্বদা সত্যিকার ভাবে সুষ্ঠু পক্ষপাতহীন ও সহিংসতা মুক্ত নির্বাচন চেয়েছে। কিন্তু সকল নির্বাচন এ মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারে নি।

নির্বাচন নিয়ে সর্বদাই একটি সংকট তৈরী হয়। প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন সকলেই প্রশ্নবিদ্ধ হয় এর পেছনে সত্যতাও থাকে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি, ভোটার তালিকা, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে সাংবাদিকগণ প্রশ্ন তোলেন। অনেক সময় তৈরী হয় রাষ্ট্রীয় সংকট।

নির্বাচন এ দেশে নতুন নয়। তার ইতিহাস নানা আকারে প্রায় শত বছরের পুরুনো। বৃটিশ শাসন আমলেও দেশে কয়েক বার নির্বাচন হয়েছে অবশ্য সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে নয়। পাকিস্তানী শাসন আমলে জনগণের পূর্ণ ভোটাধিকার প্রয়োগের ভিত্তিতে দুটি নির্বাচন হয়েছে। একটি ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ সরকারের আমলে আর দ্বিতীয়টি ১৯৭০ সালে জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক আমলে। কিন্তু ভোট কারচুপির অভিযোগ ব্যাপকভাবে উঠতে লাগলো স্বাধীন বাংলাদেশে।[২] ক্ষমতার

Dhaka University Institutional Repository

অপব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে সরকারের প্রতিটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের দলীয় করণের প্রবনতাও একই সঙ্গে শুরু হয়। সময়ের সঙ্গে এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন কি কোন রকম রাখঢাক না করে "আমদের লোক আর তাদের লোক "বলে ভাগ করা হয়। এ হিসাবে কারো নিরপেক্ষ নির্দলীয় থাকার পথও থাকে না।

৫.১ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুর্নীতির স্বরূপ ঃ

বাংলাদেশের সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুর্নীতির স্বরূপ তুলে ধরলে বোঝা যাবে যে, আমাদের নির্বাচনী দুর্নীতি কিভাবে বাড়ছে এবং তা বর্তমানে কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, ১৯৭৩ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও নানা রকম দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছিল। তৎকালীন বিরোধী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলনেতা আ,স,ম আব্দুর রব এ নির্বাচনে অনেক জাসদ প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র পেশ করতে দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন। তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন।[৩] ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাল ভোট দেবার ঘটনা প্রমাণ করে যে, নির্বাচনী দুর্নীতি হলেও তা সর্বক্ষেত্রে '৮০র দশকের কেন্দ্র দখলের পর্যায়ে পৌঁছেছিল না। সন্ত্রাসের চর্চা হলেও ভোট কেন্দ্রে কমবেশী লোক সমাগম হয়েছিল এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় জনগণ কমবেশী ভোট দিয়েছিলেন। অবশ্য বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য নেতারা সরকারী দলের ব্যাপক কারচুপি, সন্ত্রাস ও বিরোধী দলীয় এজেন্টদেরকে ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়ার অভিযোগ করেছিলেন।[৪] সামরিক সরকার লালিত মাস্তান বাহিনী যে সরকারি উদ্যোগে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক দলের স্বপক্ষে সন্ত্রাস করবে সেটাই স্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য।

১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুর্নীতি নির্বাচনী সন্ত্রাস আরো একধাপ এগিয়ে যায়।[৫] নির্বাচনী সন্ত্রাসে শুধুমাত্র নির্বাচনের দিনই (৭ই মে) ১৫জন নিহত এবং ৭৫০জন আহত হন।[৬] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেসনোট অনুযায়ী ২৮৪টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহন স্থগিত রাখতে হয়।[৭] নির্বাচন কমিশন জানায় যে, ৩৬টি নির্বাচনী এলাকায় কিছু সংখ্যক ভোট কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ভোট গ্রহন স্থগিত ঘোষণা করা হয়।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের আমন্ত্রণে 'অবাধ নির্বাচন গণকমিশন' নামে একটা পর্যবেক্ষক সংগঠনের আমন্ত্রণে তিনজন বৃটিশ নাগরিক।[৯] এ নির্বাচনে পর্যবেক্ষণে আসেন। তারা এ নির্বাচনকে গণতন্ত্রের ট্রাজেডী হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, গণতন্ত্রে উত্তোরনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী দলগুলোর জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের মতে সংসদ নির্বাচন কোনভাবেই অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। বেলা এগারটার পর জোর জবরদস্তি করে ভোট কেন্দ্র দখল ও ব্যাপক কারচুপি ছিল ভোট কেন্দ্রগুলোতে স্বাভাবিক ব্যাপার। নির্বাচন কমিশন অবশ্য এক প্রেসনোটে গণকমিশনের এ দায়িত্ব পালনকে একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সামিল বলে মনে করে। নির্বাচন কমিশন এ পদক্ষেপকে বেআইনী এবং নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারের উপর হস্তক্ষেপের সামিল বলে উল্লেখ করে।[১০]

বিদেশী সাংবাদিকদের চোখে এ নির্বাচন ছিল প্রহসনমূলক, কারচুপিজড়িত এবং ভোট ডাকাতির বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এদের অনেকেই এ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য নিজ নিজ পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন।[১১] এছাড়া এ নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকায় অবস্থানরত বিবিসি সংবাদদাতা মার্ক টালীর বক্তব্যও একই রকম। তাঁর ভাষায়, যেসব ভোট কেন্দ্রগুলোতে আমি গিয়েছি সেগুলোর সবকটিতে ভোটদাতাদের সংখ্যা ছিল কম। রিটার্নিং অফিসারেরা স্বীকার করেন যে, ভোটাররা কম হারে ভোট দিতে এসেছেন।[১২] অধিকাংশ সাংবাদিকদের মতে এ নির্বাচনে ভোটাররা শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ হারে ভোট দিয়েছেন।[১৩] কাজেই এ নির্বাচন কতটা অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছিল এবং এতে গণ রায়ের কেমন প্রতিফলন ঘটেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নির্বাচনী দুর্নীতি চূড়ান্ত প্রহসন ও বুথ দখলের খেলায় পরিণত হয় ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।[১৪] এ নির্বাচনে দেশের অধিকাংশ নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটাররা ভোট দিতে আসেন নি। রাজপথ ছিল জনশূণ্য। ভোট কেন্দ্রে প্রার্থীদের নির্বাচনী ক্যাম্প ছিল না, ছিল না ভোটারদের আনা নেওয়ার জন্য যানবাহনের ভিড়। এক কথায় এ নির্বাচন ছিল অতীতের নির্বাচনী ট্রাডিশন বহির্ভূত এবং নির্বাচনী উত্তাপ বিবর্জিত। প্রধান দুটি বিরোধী রাজনৈতিক জোট এ নির্বাচন বর্জন করায়

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী সন্ত্রাসে সরকারী দলের (জাতীয় পার্টি) আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বেগ পেতে হয়নি। তবুও নির্বাচনী সন্ত্রাস হয়েছে এবং শুধুমাত্র ঢাকায় ৭২টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত হয়ে যায়। নির্বাচনী গোলযোগে শুধু ঢাকাতেই সাত জন নিহত এবং তিন শতাধিক আহত হন, যার মধ্যে ৬৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[১৫]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুর্নীতির স্বরূপ থেকে প্রমাণিত হয় যে নির্বাচন দুর্নীতি, কারচুপি ও সন্ত্রাস অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে সম্প্রতি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে, পেশীশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার বর্জিত অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান কল্পনায় পরিণত হয়। প্রতিটি নির্বাচনেই যে পেশীশক্তি ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারের চর্চা হচ্ছে তার প্রতিফলন নির্বাচনোত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতায় নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা ও সৃষ্টিতে উপাদান যোগাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন প্রথমবারের মত একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রবল গণআন্দোলনের চাপে ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগের পর তার কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণকারী বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের অস্থায়ী সরকারকে সকল রাজনৈতিক দল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়। এ নির্বাচন দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং নির্বাচন কমিশন নজিরবিহীন সতর্কতা ও নতুন নতুন উপায় অবলম্বন করেন।

নির্বাচন মানেই টাকার ছড়াছড়ি ঃ

নির্বাচন মানেই টাকার ছড়াছড়ি । এটা আমরা বিগত কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জোরালো হয়ে উঠতে না পারায় এই অনাকাঙ্খিত ঘটনাগুলো ঘটেই চলছে। এ কারণেই নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদদের টাকার জোরে হটিয়ে দিয়ে সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে কালো টাকার মালিকেরা। আমরা পত্রিকার মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

জানতে পারি কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে মনোনয়ন বিক্রি হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরাসরি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সাংসদের সংখ্যা ছিল ৬৮ শতাংশ, সপ্তম সংসদেই তা বেড়ে দাড়িঁয়েছে ৭২ শতাংশে আর অষ্টম সংসদে তা বেড়ে হয়েছে ৮৮ শতাংশ।[১৬] নির্বাচন ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে ত্যাগী রাজনীতিবিদেরা ধীরে ধীরে জাতীয় রাজনীতিতে অপাঙ্গতেয় হয়ে যাচ্ছেন এবং টাকার জোরে তাঁদের স্থান পূরণ করেছেন ব্যবসায়ীরা। এর ফলশ্রুতিতে আমরা লক্ষ্য করি নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে যারা অর্থ ব্যয় করে নির্বাচিত হন, তাঁরা পরবর্তীতে সে অর্থ সুদে আসলে ফিরে পেতে চান। এ কারণে জনগণের সেবার অঙ্গীকার পরিবর্তিত হয়ে ব্যক্তি ও দল সেবায় পরিণত হয়। আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা দুর্ভাগ্যজনক ও ক্ষতিকর। জাতীয় নির্বাচনে বেশীর ভাগ প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়ের সীমারেখা অতিক্রম করেন, ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যেই নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার বিধান থাকলেও তা মানা হয় না। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো নির্বাচন (বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে) প্রচুর টাকা খরচ করা হয়। যার অধিকাংশই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগৃহীত কাল টাকা।[১৭] বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা একই বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই।

৫.৩ সামরিক - বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য ঃ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গোড়া থেকে বেসামরিক আমলাদের আধিপত্য লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের প্রথম থেকে যদিও শেখ মুজিবর রহমান আমলা-প্রভাব কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করেন। তিনি আমলাদের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রশাসনে স্বীয় দলের প্রাধান্য এবং হস্তক্ষেপের জন্য তিনি আমলাদের বিরাগভাজন এবং তাদের আশানুরূপ সহযোগিতার লাভে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে জেনারেল জিয়ার আমলেও সামরিক বেসামরিক এলিটদের আধিপত্য উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্যণীয়। ১৯৮১ সালের ২৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভার এক চতুর্থাংশ ছিলেন সামরিক আমলা এবং প্রায় অর্ধেক ছিলেন বেসামরিক আমলা ও টেকনোক্যাট। জেনারেল এরশাদের শাসন আমলেও বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। ১৯৮৮ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এরশাদের মন্ত্রিসভায় সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের অবস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক আমলা	১৩ জন
বেসামরিক আমলা	৯ জন
বুদ্ধিজীবী আমলা	৭ জন
ব্যবসায়ী	৬ জন
মোটঃ	৩৫ জন

এরশাদের পতনের পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভায় ও কতিপয় সামরিক ও বেসামরিক আমলার অনুপ্রবেশ ঘটে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতৃত্বে এই ধারাবাহিকতা লক্ষ্যণীয় হয়। বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেও অনেকে সেনাবাহিনীর প্রচ্ছন্ন সরকার বলে আখ্যায়িত করেন।

৫.৪দলছুট প্রবণতা ও ডিগবাজি নেতৃত্ব ঃ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যেমন বিভিন্ন দল ভাঙ্গার ও নতুন দল গড়ার হিড়িক দেখা যায়, ঠিক একই প্রক্রিয়ায় উদ্ভব ঘটে দলছুট এবং ডিগবাজি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের। বার বার সরকার পরিবর্তন হয় কিন্তু একই মুখ এবং একই নেতা ঘুরে ফিরে আসে।

৫.৫ উত্তরাকিার সূত্রে পাওয়া নেতৃত্ব ঃ

বাংলাদেশের নেতৃত্ব অনেকটা পরিবারতান্ত্রিক, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শেখ মুজিবর রহমানের কারিশমা ও ধারাবাহিকতার ভিত্তিতেই শেখ হাসিনা নেতৃত্ব দান করছেন। অপরদিকে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও তার স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতায় এসেছেন। এভাবে বাংলাদেশের বড় বড় দুটো রাজনৈতিক দল পুরোপুরি পরিবারতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে। যা আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক চর্চাকে ব্যাহত করছে। কেননা, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দলের স্বার্থের থেকে নিজের স্বার্থের প্রতি অতি আগ্রহী। ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিকাশ লাভ করছে না।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬ আদর্শিক দোদুল্যমানতা ঃ

এদেশের অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আদর্শিক দোদুল্যমানতায় ভোগেন। যে নীতি গ্রহণ করেন আনুষ্ঠানিকভাবে, কখনো তা থেকে বিচ্যুতি গ্রহন করেন আনুষ্ঠানিকভাবে, তা তারা নিজেরাও ভেবে দেখে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কখনো সচেতনভাবে, কখনো আবেগে, আবার কখনো কোনো আদর্শ বা কখনো নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছে। আর এক্ষেত্রে ধরন, দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলের পার্থক্য থাকলেও একই ভূমিকা পালন করেছে সবাই। এখনো অনুরূপ ভূমিকার অবতীর্ণ রয়েছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রায় অধিকাংশ নেতা। সব বিষয়ে নেতার সিদ্ধান্ত অমর বাণী হিসেবে গ্রহন করা হয় এবং ফলশ্রুতিতে সামগ্রিক ভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত হয়েছে নেতার আজ্ঞাবহ একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব একই ধারাবাহিকতা প্রবলভাবে অব্যাহত রয়েছে ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য আরো যেসব সাধারণ প্রবণতা ধরা পড়েছে তা হলো ঘন ঘন দল পরিবর্তন, কর্তৃত্ব পরায়ণতা, চারিত্রিক দুর্বলতা ও দুর্নীতি পরায়ণতা, বহিঃশক্তির নির্ভরতা, অযোগ্যতা, মধ্যবিত্ত সুলভ আপোসকামী মানসিকতা প্রভৃতি। ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এবং রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও স্থবির হয়ে পড়েছে। এ সংকট নিরসনের জন্য প্রয়োজন এমন একটি আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও পরিবেশ নির্মাণ এবং রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলন যার মাধ্যমে বিকশিত হবে দৃঢ় চেতনা, দক্ষ ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বের। কারণ একমাত্র সৎ, দক্ষ ও যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বই বাংলাদেশের মত একটা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে তার সমৃদ্ধির ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে।

৫.৭ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব ঃ

বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাস যোগ্যতার অভাবের ফলে গণতান্ত্রিক চর্চা ব্যাহত হয়। এটা বাস্তব সত্য যে, ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সকল নির্বাচনেই সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন দলসমূহ ব্যাপক কারচুপি করেছে। ভোট চুরির প্রকৃতি একেক

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের একেক রকম ছিল। সামরিক শাসনামল কিংবা সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল নির্বাচনেই ছিল প্রহসন। কেননা, সামরিক শাসন ও নির্বাচন এ দুটো পরস্পর বিরোধী।

পরবর্তীতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ কিছুটা হলেও নিশ্চিত হয়। তাছাড়া অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিকল্পনার জন্য সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের কথা বলা হয়। তাছাড়া অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে ২৯ জানুয়ারি ২০০৮ উপদেষ্টা পরিষদে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে গঠনের অধ্যাদেশ অনুমোদন করে। এবং অধ্যাদেশটি রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি করে আইনে প্রণীত করে।

অধ্যাদেশ অনুসারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের আওতাধীন থাকবে না। নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত, সীমানা নির্ধারণ, ফলাফল সংগ্রহের যাবতীয় কাজ করে এ সচিবালয়। এর ফলে দেশে নির্বাচন অনেক স্বচ্ছ ও অবাধ হবে।

৫.৮ রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ ঃ

আমাদের দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ লোক গ্রামে বসবাস করে। তাদের বেশিরভাগই কৃষিজীবী ও অশিক্ষিত এবং অনেকটাই আত্মকেন্দ্রিক। এরা নিজেদের নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া তারা অর্থনৈতিক ভাবে অনেক দুর্বল বিধায় সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না।

আমাদের দেশের স্থানীয় কাঠামো ও প্রশাসন গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপকতা লাভ করেনি। ফলে জনগণ রাজনীতিতে তেমন অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় না এবং তারা ৪/৬ বছরে একবার ভোট দেয়াটাকেই তাদের দায়িত্ব মনে করে। সরকার পক্ষ থেকে গ্রামীণ জনগণকে সচেতন করার জন্য তেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে মানুষ রাজনীতি সচেতন হচ্ছেনা। নির্বাচন সম্পর্কে তাদের ধারণাও স্বচ্ছ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকট ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সামজিক নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণেও শহরের মানুষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

যদিও সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। তাই নির্বাচন ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর ও বাস্তব সম্মত করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫.৯ রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ সৃষ্টির লগ্ন থেকে রাজনৈতিক দলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু পূর্বে যে আদর্শিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, জনগণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো পরিচালিত হতো বর্তমানে এই মূল্যবোধের অভাব খুবই লক্ষ্যণীয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সমন্বয়ের অভাব, সহনশীলহীনতা, ক্ষমতার লিপ্সা, বিরোধীদলের প্রতি কঠোর মনোভাব, সর্বোপরি অগণতান্ত্রিক চর্চা বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া দলগুলোর কোনো নিবন্ধন নেই, নির্বাচনী ইশতেহারে তোয়াক্কা নেই। তারা নেতা/নেত্রীর হুকুমকেই সব মনে করে। এখানে স্থানীয় পর্যায় থেকে কর্তৃত্ব ও নেতা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের তথা দলের একজন নেতার কাছে কুক্ষিগত থাকে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোতে পরিবারতন্ত্র ব্যাপক রূপলাভ করেছে। এখানে ক্ষমতা একটি পরিবারের মাঝেই আবদ্ধ থাকে। ফলে অন্যান্য নেতাদের সুযোগ অনেক কম থাকে। এসব আমাদের রাজনৈতিক দলের সাধারণ চিত্র। রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে যথাযথ নির্বচনী সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব।

আমরা সকলে যদি সম্মিলিত ভাবে ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ ও দলস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও জাতির স্বার্থকে একমাত্র উদ্দেশ্য করে কাজ করি তবেই শুধু এর সমাধান সম্ভব। আর আমরা যদি এতে ব্যর্থ হই, ভবিষ্যৎ নিশ্চিত অন্ধকার।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১০ তথ্যপুঞ্জী ঃ

১. মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

২. দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারী ২০০৭

৩. জগলুল আল, বাংলাদেশ বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-৮৯ (ঢাকা ঃ প্রতীক প্রকাশনা, সংস্থা, ১৯৯০) পৃষ্ঠা- ৮৬

৪. এ ধরনের অভিযোগকারীদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের তদানীন্তন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক যথাক্রমে আবদুল মালেক উকিল, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ, মুসলীম লীগ নেতা খান এ, সবুর, আওয়ামী লীগ (মিজান) এর সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী, এবং জাসদের শাজাহান সিরাজ। দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক ১৯শে এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯

৫. সাপ্তাহিক রোববার, ১১ই মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-১১

৬. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ই মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২০

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২১

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০

Dhaka University Institutional Repository

৯. এ তিনজন বৃটিশ নাগরিক ছিলেন, লর্ড এ্যানালস, মার্টিন ব্রাউন ব্রাডো (এমপি) ও বিবিসি'র ডেভিড জনলে।

১০. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ই মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ২৩, ২৪ ও ২৭

১১. এ সকল বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন, লস এ্যাঞ্জেলস পত্রিকার সংবাদদাতা বন টেমেষ্ট, টাইমস পত্রিকার মাইকেল হ্যামিলন, ফিনানসিয়াল টাইমস এর জন এলিয়ট গার্ডিয়ান পত্রিকার এরিখ সিলভার, নিউয়র্ক টাইমস এর ষ্টিফেন আর, ওয়াইজম্যান প্রমূখ।

১২. এ সম্পর্কিত মার্ক টালীর প্রতিবেদন বিবিসি থেকে ৭ই মে, ১৯৮৬, রাতে প্রচারিত হয়।

১৩. সাপ্তাহিক রোববার, ১০ই মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ১১

১৪. ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নির্বাচন না বলে বুথ দখলের খেলা' হিসাবে বর্ণনা করা হয়। দেখুন সাপ্তাহিক রোববার, ১১ই মার্চ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৯

১৫. সাপ্তাহিক রোববার, ৬ই মার্চ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ১৫-১৬

১৬. প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারী ২০০৭

১৭. A. Hariharan, "India A Common Goal: Get-Rich-Quick" Far Eastern Economic Review 85, 35 6th September, 1974 p. 25

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন

৬.১ গণতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থার গুরুত্ব ঃ

বর্তমানে বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোর প্রায় অধিকাংশ নাগরিকের ভোটাধিকার রয়েছে। তাই এখন প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা। নির্বাচনই হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে আইন সভার প্রতিনিধি ও শাসন কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের পক্ষে আইন প্রণয়ন করে ও শাসন কার্য পরিচালনা করে। অ্যানাল বল বলেছেন, নির্বাচন হল প্রতিনিধির পছন্দ ও প্রতিনিধির উপর কিছু মাত্রায় জনসাধারণের নিয়ন্ত্রন বজায় রাখার এক উপায়।[১] অ্যানাল বল স্বীকার করেছেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক যোগযোগ গড়ে উঠে। সিদ্ধান্তকারীকে নির্বাচকমন্ডলীর দাবি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। আর তাই এভাবেই রাজনৈতিক বিষয়ে নির্বাচক মন্ডলী শিক্ষিত হয়ে উঠে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জনগণের রাজনৈতিক যোগাযোগের এক ব্যাপক সুযোগের সৃষ্টি হয়। তাই অধ্যাপক বলের অভিমত, যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অধিকাংশ নাগরিকের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ গ্রহণের একমাত্র উপায় হল এ নির্বাচন।[২]

৬.২ নিরক্ষেপ নির্বাচন ঃ

গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন অপরিহার্য। এর মাধ্যমে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। নির্বাচন শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে মনোনয়ন, বাছাই বা নিজের শ্রেষ্ঠ মতকে প্রতিষ্ঠিত করা, নির্বাচন কোন প্রতিষ্ঠান বা দপ্তরের কোন পদে প্রার্থীদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক প্রার্থীকে বাছাই প্রক্রিয়া, যেমন : সরকার, আইন সভা এবং বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলোতে নির্বাচক মন্ডলী কতৃক প্রকাশ্য বা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়।[৩] বর্তমান প্রতিযোগীতা মূলক বিশ্ব ব্যবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

"নির্বাচন" শব্দটির পূর্বে একটি লুকায়িত প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি হয় তা হলো "নিরপেক্ষ"। মানব সভ্যতার বিকাশের ফলে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার, উন্নত সামরিক জোট, প্রশাসন যন্ত্র, ক্ষমতার দাপট, শক্তিশালী মিডিয়া, ইত্যাদি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে "নিরপেক্ষতা" কে চ্যালেঞ্জের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

নিরপেক্ষ নির্বাচন বলতে পক্ষপাতহীন, শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বুঝায়। অর্থাৎ নির্বাচন পরিচালনাকারী, কর্তৃপক্ষ কোনরূপ পক্ষ সমর্থন না করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে একটি নির্বাচন পরিচালনা করবে। এখানে প্রশাসন যন্ত্র থেকে শুরু করে নির্বাচন পরিচালনার সাথে জড়িত সকলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিরোধীদলসহ সমগ্র নির্বাচকমন্ডলী যেন ভয়ভীতিহীনভাবে তাদের পছন্দনীয় প্রার্থীকে ভোট প্রদান করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কালো টাকা বা পেশী শক্তি যেন কোনভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে না পারে। "আমার ভোট আমি দিব, যাকে খুশি তাকে দিব"-এ শ্লোগানটিকে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাড় করানোর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে এবং জনস্বার্থে আইন প্রণয়ন করবে, নিরপেক্ষতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের মাধ্যমেই কেবল পরবর্তী নির্বাচনের তাদের নির্বাচন করা হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা গণতন্ত্রের চারণ ভূমি হিসেবে মনে করি। সেখানেও ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী নিরপেক্ষ নির্বাচনকে কলঙ্কিত করে তুলেছিল। কিছু দিন পূর্বেও নির্বাচনের ক্ষমতার দাপট ও পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ উঠেছিল। তবু সহনশীলতা প্রদর্শন করে মেনে নেয় মার্কিন জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু হাজারো সমস্যায় জর্জরিত তৃতীয় বিশ্বে নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি আরো জটিল। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসারতা, শিক্ষার অনগ্রসারতা, দূর্বল প্রশাসন যন্ত্র, উপনিবেশিক ধাচের আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি - নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের একটি পন্থা হল নির্বাচন।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে দেখা যায় নির্বাচন নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা প্রশ্ন। প্রতিটি জাতীয় নির্বাচন সৃষ্টি হয় জনমনে আতঙ্ক। পরাজিত পক্ষ নির্বাচনকে মেনে নিতে চায় না। তাই রাজনৈতিক দল, সিভিল সোসাইটি ও উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে সংস্কারের কথা আসছে। বর্তমানের বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনে আমরা সবাই খুশি। এবারের নির্বাচন আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। আমাদের গণতন্ত্র কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আশির দশকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো বৈধতার প্রশ্নে সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়নি। খুব কম সংখ্যক ভোটার ভোট দিতে পারত বিধায় কেউ ভোট কেন্দ্রে যেতে আগ্রহ দেখাত না। সে সময় পত্র পত্রিকায় এ রকম খরবও বেরিয়েছে যে, মৃত লোকেরও ভোট দেয়া হয়েছে। এমনকি একটি কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যার চেয়েও বেশি ভোট কাস্ট হয়ে গেছে। কালো টাকা ও পেশী শক্তির প্রভাব ছিল একচেটিয়া। সরকারি ক্ষমতায় থাকা দলের প্রভাব ছিল সীমাহীন। সরকারি অর্থ, যানবাহন বেপরোয়া ব্যবহৃত হয়েছে। তাই নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য শুরু হয় সংস্কার আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ নানা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। সময়ের পরিক্রমায় এ ব্যবস্থাও হয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ। অর্থাৎ "নিরপেক্ষ নির্বাচন" কথাটি বারবার উচ্চারিত হয়েছে। নির্বাচন নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের জন্য একটি অত্যাবশকীয় কর্মসূচী। এর মাধ্যমেই জনগণ তাদের রায় দিতে পারে এবং একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠনের বৈধতা পায় কিন্তু নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য হলেও তার সব নয়। নির্বাচন অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু, অবাধ ও স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচন নিরপেক্ষ না হলে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে না তাদের পক্ষে নির্বাচনের রায় মেনে নেয়া কঠিন হয়। নির্বাচনের রায়ের প্রতি সকল দলের আস্থা ও স্বীকৃতি লাভের জন্যই একে বিতর্কের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী দল বিরোধী দলকেও যথাযথ সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বলে তাকে হেয় করা যাবে না। এর অন্যথা হলে নির্বাচনের পর রাজনীতিতে অস্থিরতা হয়ে উঠবে অনিবার্য। বাংলাদেশের গণতন্ত্র চর্চায় যদি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠা যায় তবে তা বিশাল পরিবর্তন এনে

Dhaka University Institutional Repository

দিবে। আর তাই হচ্ছে সংস্কার। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে নির্বাচন হতে হবে নিরপেক্ষ। গবেষণায় এ বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে।

৬.৩ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ঃ

গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থাগুলার মধ্যে সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচকমন্ডলীর ন্যায় নির্বাচন পদ্ধতিরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এ নির্বাচন পদ্ধতির উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনের দুটি প্রচলিত পদ্ধতি আছে।

(ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন

(খ) পরোক্ষ নির্বাচন

(ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন ঃ

নির্বাচক বা ভোট দাতাগণ যখন প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন তখন তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলে। বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্রিটেন, ভারত, বাংলাদেশের আইন পরিষদের সদস্যগণ এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

(খ) পরোক্ষ নির্বাচন ঃ

এ পদ্ধতিতে ভোট দাতাগণ সরাসরি ভোট না দিয়ে একটি মাধ্যমিক সংস্থা নির্বাচন করে এবং সেই মাধ্যমিক সংস্থার প্রতিনিধিগণই চূড়ান্তভাবেই প্রতিনিধি নির্বাচন করে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় সাধারণ ভোট দাতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সরাসরি কোন সম্পর্ক থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় নির্বাচন পদ্ধতিই কার্যকর আছে। তবে রাষ্ট্রপতি ও সংরক্ষিত মহিলা আসন ছাড়া জাতীয় ও স্থানীয় সকল পর্যায়ে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত। সংবিধানের ১২২ (১) ধারায় উল্লেখ রয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।[৫]

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ-

(১) গণতান্ত্রিক ঃ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হইবে।[৬]

(২) নির্বাচন কমিশন ঃ

বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র নির্বাচন কমিশন রয়েছে। সংবিধানের ১১৮ (১) ধারায় উল্লেখ আছে। "প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশানরকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে।[৭]

(৩) নিয়মিত নির্বাচিত অনুষ্ঠান ঃ

বাংলাদেশে নির্দিষ্ট সময়ে ও নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে কোন কারণে যদি কোন আসন শূণ্য হয় তবে তা নির্ধারিত সময়ে উপনির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। সংবিধানের ১২৩ ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে- উপধারা ১(৩), মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। উপধারা (৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূণ্য হইলে পদটি শূণ্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূণ্যপদ পূরণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

(৪) সর্বজনীন ভোটাধিকার ঃ

বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃত রয়েছে। জাতি, ধম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক বাংলাদেশের সকল সুস্থ নাগরিক ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়।

(৫) ছবি সহ ভোটার তালিকা ঃ

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিটি এলাকার জন্য ভোটার তালিকা থাকবে। বাংলাদেশে ছবিসহ ভোটার তালিকা কার্যক্রম রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রে "এক ব্যক্তি, এক ভোট" নীতি প্রচলিত রয়েছে।

(৬) সহজ ভোট পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশের ভোট পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল। প্রার্থীর নাম ও প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পত্রের যে কোন এক স্থানে ভোটারগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীল ব্যবহার করেন।

(৭) গোপন ভোট পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশে প্রতিটি নির্বাচনে গোপন ভোটদান পদ্ধতির ব্যবস্থা রয়েছে। নির্বাচনের সময় ভোট কেন্দ্রের বুথে বেষ্টনি দিয়ে ভোটারদের ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়।

(৮) একক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনী এলাকা ঃ

আয়তন ও জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে সমগ্র বাংলাদেশকে একক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন প্রতিনিধি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

(৯) স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ঃ বর্তমানে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় এক নতুন সংস্করন হল স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স। আধুনিক বিশ্বের সাথে সমন্বয় রেখে নির্বাচনকে আরো স্বচ্ছ করতে এ ব্যবস্থা আরো ফলপ্রসূ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ নির্বাচন কমিশন [৪৯]

নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা। জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা তৈরি, ভোট গ্রহণ তত্ত্বাবধান, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনী অভিযোগ-মোকদ্দমা মীমাংসার লক্ষ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা নির্বাচন কমিশনের কাজ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম ভাগে নির্বাচন কমিশনের গঠন-কাঠামো, ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা আছে।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে ঃ-

নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা ঃ

ধারা ঃ ১১৮

(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দান করিবেন।

(২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না;

(খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।

(৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ঃ

ধারা ১১৯।

(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যাস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(খ) সংসদ সংসদ্যসের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(গ) সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহ নির্ধারিত দায়িত্ব সমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ ঃ

ধারা-১২০

এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেইরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

প্রতি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটার তালিকা ঃ

ধারা-১২১।

সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করিয়া ভোটার তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী পুরুষের ভিতিত্তে ভোটারগণ বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না।

ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা ঃ

ধারা-১২২।

(১) প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হইবেন, যদি

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;

(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে; এবং

(ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ঃ

ধারা-১২৩।

(১) রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূণ্য হইলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই হইতে ষাট দিনের মধ্যে শুণ্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন সেই সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শুণ্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূণ্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর নব্বই দিনের মধ্যে, তাহা পূর্ণ কবিরার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত কোন কোন কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূণ্য হইলে পদটি শূণ্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূণ্য পদ পূরণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোন দৈব-দূর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবতী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

নির্বাচন সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ

ধারা-১২৪।

এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা ঃ

ধারা-১২৫। এই সংবিধানের যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্বত্ত্বেও

(ক) এই সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য আসন বন্টন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না;

(খ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা অধীন বা বিধান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা দান ঃ

ধারা-১২৬।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

৬.৫ নির্বাচনী আইন ঃ[১০]

নির্বাচনী আইন নির্বাচন সংক্রান্ত আইনবিধান। সুষ্ঠভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা, প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারীদের আচরণ ব্যাখ্যা করা এবং এ সম্পর্কিত বিধি বিধান লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান সুনিশ্চিত করা নির্বাচনী আইনের লক্ষ্য।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়। সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দান করেন। নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনের আওতায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রন এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যাস্ত। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এর আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ প্রণীত হয়। এসব আদেশ ও বিধিমালার সমন্বয়েই নির্বাচনী আইনবিধান গঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এ আদেশের ৩ ধারায় উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। আদেশের ৫ ধারাবলে নির্বাচন কমিশন যে কোন ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষকে তার যেরূপ দায়িত্ব পালন এবং যেরূপ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন সেরূপ দায়িত্ব বা সহায়তা প্রদানে নির্দেশ দিতে পারেন। নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কোন কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধা দান বা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার মতো কোন কাজ করলে, নির্বাচন কমিশন যেকোন সময় নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাকে বা তাদের অব্যাহতি দিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ ৭ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এক বা একাধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন। বিধিবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত। সহকারি রিটার্নিং অফিসারগণও রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে রিটার্নিং অফিসারের কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। ৯ ধারায় রিটার্নিং অফিসারকে ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি প্যানেল তৈরির কথা বলা হয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১১ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ নির্ধারণ ও প্রচারে নির্বাচন কমিশনকে প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১২(১) ধারায় জাতীয় সংসদের সদস্যপদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে। ১৩ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানত প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। ১৪ ধারায় মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত রয়েছে। ১৪(৫) ধারায় রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়েরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৫ ধারায় বৈধ মনোনীত

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। ১৬ (১) ও ১৬ (২) ধারা অনুসারে বৈধভাবে মনোনীত যে কোন প্রার্থী তার নিজ স্বাক্ষরে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

আদেশের ১৭(১) ধারায় বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচন বাতিলের কথা বলা হয়েছে। ১৯ ধারায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। ২০ ধারায় নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পছন্দ অনুযায়ী প্রতীক বরাদ্দের বিধান রয়েছে। ২০(২) ধারা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্পর্কিত পোস্টার প্রত্যেকে ভোট কেন্দ্রে প্রদর্শন করতে হবে। ২১ (১) ধারায় প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী এজেন্ট এবং ২১(২) ধারায় পোলিং এজেন্ট নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। ২৭(২) ধারা অনুসারে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ৮ ধারার (২), (৩) অথবা (৪) উপধারায় বর্ণিত ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পোস্টার ব্যালটে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আদেশের ৩৭ ধারায় প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একত্র করা এবং ৩৭(৫) ধারায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা তার প্রতিনিধির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট পুনঃগণনার বিধান রয়েছে। ৩৯(১) ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। ৪৪-ক ধারার (১) উপধারা অনুসারে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস-বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেবেন। ৪৪-খ ধারায় (৩) উপধারায় প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা (সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা) নির্ধারিত হয়েছে। ৪৪-গ ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং নির্বাচনী এজেন্টদের নির্দেশ দেবেন। ৪৯(১) ধারা অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে কোন প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

আদেশের ৭৩ ধারার ৪৪-ক ও ৪৪-খ এর বিধান লঙ্ঘন, ঘুষ গ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ, নির্বাচনে অসঙ্গত প্রভাব খাটানো, কোন প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যে বিঘ্ন সৃষ্টি বা তার নিজস্ব বা আত্মীয় স্বজনের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোন প্রার্থীর প্রতীক বা প্রার্থীতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোন প্রার্থীর বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দানের আহ্বান বা প্ররোচিতকরণ, ভোটার উপস্থিতিতে বা ভোটদানের বাধা দান এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘুষ গ্রহণকে দুর্নীতিমূলক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ৭৪ ধারায় বেআইনী আচরণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।৭৮ ধারায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সকল স্থানে জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান ও তাতে যোগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ বিধান লঙ্ঘিত হলে ৭৮(২) ধারা অনুসারে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদন্ড হতে পারে। ৮০ ধারায় ভোটকেন্দ্রের কাছে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য জরিমানাসহ উর্ধ্বে ৩ বছর, নিম্নে ৬ মাস কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে (কগনিজিবল অফেন্স)। ৮১(১) ধারায় ব্যালট চুরি, জালভোট দান, সীলমোহর ভেঙ্গে ফেলা, নির্বাচন পরিচালনায় বাধা দান প্রভৃতি অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ১০ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছর জরিমানাসহ সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। (কগনিজিবল অফেন্স)।

আদেশের ৮৪ ধারায় বলা হয়েছে, নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন সদস্য প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করলে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন (কগনিজিবল অফেন্স)। ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত থেকে কোন ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করলে তিনি জরিমানাসহ উর্ধ্বে ৫ বছর, নিম্নে ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হতে পারেন। ৯১ ধারা অনুসারে বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন এবং চাপসহ অন্যান আচরণমূলক কার্যকলাপ চালু থাকার কারণে সুষ্ঠু ও আইন সম্মতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হলে নির্বাচন কমিশন যে পর্যায়ে যে কোন ভোট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন। ৯১-খ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণের প্রাক্কালে অনিয়ম ও রোধ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করতে পারবেন। বিচার

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষে হওয়ার পূর্বেই তদন্ত পরিচালনা করবে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোর্ট পেশ করবে।

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯১ জারি রয়েছে। এ আইন দ্বারা নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ (১৯৯০ সালের অধ্যাদেশ নং-৩১) রহিত করা হয়। এ আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরি ও তার নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত বিধি জারি রয়েছে। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে, তিনি কমিশন বা ক্ষেত্র বিশেষে রিটার্নিং অফিসারের কাছে গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া তার দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করতে পারবেন না। নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তার চাকুরির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে কমিশনের অধীনে চাকুরিরত আছেন বলে গণ্য হবেন।

এ আইনের ৫ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার শৃঙ্খলামূলক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কোন নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রদত্ত নির্বাচন কমিশন বা ক্ষেত্রবিশেষে রিটার্নিং অফিসারের কোন আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করলে তা অসদাচরণ বলে গণ্য হবে এবং ঐ অসদাচারণ তার চাকুরিবিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ৯৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সরকার নির্বাচনী বিধিমালা ১৯৭২ প্রণয়ন করে। এই বিধিমালার ৫ বিধিতে মনোয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে প্রার্থীকে আপিল করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। ৬ বিধিতে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের প্রক্রিয়া বিবৃত হয়েছে। ৭ বিধিতে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রতীক বরাদ্দসহ চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। ৮ বিধিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার প্রক্রিয়া এবং ৯ বিধিতে প্রতীক তালিকা উল্লিখিত হয়েছে। ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ বিধিতে ব্যালট পেপার তৈরির পদ্ধতি, পোস্টাল ব্যালট ইস্যু ও তার ভোট রেকর্ড, নিরক্ষরদের ভোট রেকর্ডের প্রক্রিয়া, পোস্টাল ব্যালটের রিটার্ন এবং রি-ইস্যু করার পন্থা বিবৃত হয়েছে। ১৫-ক বিধিতে ব্যালট বাক্স রেকড, ১৬ ও ১৭ বিধিতে ব্যালট পেপার মার্কিং এবং ১৮ বিধিতে তা বাক্সে পূরণের পদ্ধতি বলা হয়েছে। ২০ বিধিতে প্রার্থী কর্তৃক ভোট চ্যালেঞ্জ প্রক্রিয়া, ২১ বিধিতে বিধিতে পরিত্যক্ত ব্যালট বাতিলের প্রক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। ২২, ২৩, ২৪, ২৫ বিধিতে বর্ণিত হয়েছে ভোট গণনা, প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক বিবরণ তৈরি, একত্রীকরণের পদ্ধতি। ২৬ বিধিতে পাবলিক ইন্সপেকশন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৯১-খ ধারার ক্ষমতা বলে নির্বাচন কমিশন আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার ৩ ধারায় চাঁদা, অনুদান ইত্যাদির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জনসমক্ষে পেশ করা যাবে। তবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোন প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোন প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা যাবে না, অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাবে না। ৫ বিধিতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকবে; কোন প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড করা বা তাতে বাধা প্রদান করা যাবে না। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল বা তার পক্ষে কেউ নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারি যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার হতে বিরত থাকবেন। নির্বাচনী প্রচারণার পোস্টার দেশ কাগজে সাদাকালো রঙের হতে হবে। নির্বাচনী প্রচারনা হিসেবে সকল প্রকার দেয়াল লিখন থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আচরণ বিধিমালার ৬ বিধিতে বর্ণিত হয়েছে যে অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাবে না। ৭ বিধিতে বলা হয়েছে, ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। কেবল পোলিং এজেন্টগণ তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থেকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাবেন। ৮ বিধিতে বলা হয়েছে, এ বিধিমালার যেকোন বিধান লঙ্ঘন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে এবং ঐ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল প্রতিকার চেয়ে ইলেক্টোরাল এনকোয়ারি কমিটি বা নির্বাচন কমিশন বরাবরে আর্জি পেশ করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশন বরাবরে পেশকৃত আর্জি কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হলে কমিশন তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যেকোন ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। উভয় ক্ষেত্রে ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৫৫) এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করে কমিশন বরাবরে সুপারিশ পেশ করবে।

গনপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ২০০৯ঃ[১১]

অবাধ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে (Rpresentation of the People Order 1972) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ সংশোধন করা প্রয়োজন হয়। এ জন্য সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীতার কিছু অযোগ্যতা নির্ধারণ করে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের শর্ত নির্ধারণ করে। ফলে

১। সরকারি কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের পর হতে ৩ বছরের মধ্যে নির্বাচনে অযোগ্য হবে।

২। কোন ব্যক্তি ৩ বছর পূর্ব হতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সদস্য না হলে তাকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা।

৩। যুদ্ধাপরাধী হিসাবে দন্ডিতদের নির্রাচনে অযোগ্য ঘোষণা।

৪। নির্বাচনে কোন প্রার্থীর তিনটির অধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা।

৫। 'না' ভোট প্রদান।

৬। নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা বাড়ানো

৭। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ হওয়া আইন অনুযায়ী নবম জাতীয় সংসদ অবিধেশন শুরুর তারিখ অর্থাৎ ২৫শে জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ৬ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২৪ জুলাই ২০০৯ এর মধ্যে গঠনতন্ত্র জমা দেওয়ার সময় ছিল। গণপ্রতিনিধিত্ব আদশে আরপিও (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল-২০০৯ সংসদের পাশ হওয়ার নবম সংসদ অধিবেশন শুরুর তারিখ হতে ১২ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২০১০ সালের ২৪ জানুয়ারির মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচন কমিশনে স্থায়ী গঠনতন্ত্র জমা দিতে হবে। (ঢাকা, ২ নভেম্বর, শীর্ষ নিউজ ডটকম)। গঠনতন্ত্র জমা না দিলে নিবন্ধন বাতিল।

৬.৬ ঃ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনামূলক নির্বাচন পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ ঃ

বিশ্বে আজও অনেক দেশ আছে যাদের প্রতিনিধি একই ধারায় অথবা নির্বাচনের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতা সহ পরিচালিত হয়ে আসছে। সেই সব দেশের সংবিধানে নির্বাচনের ধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল যেমন-

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কেন্দ্রিয় প্রশাসনের প্রধান প্রেসিডেন্ট ৪ বছরের জন্য জনগন কর্তৃক সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। তারপর তিনি কয়েকজন সচিবের দ্বারা মূলত; দেশ পরিচালনা করেন। ২ জন করে ছয় বছরের জন্য সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। উচ্চ কক্ষ সিনেট ১০০ সদস্য নিয়ে গঠিত। নিম্নকক্ষ ৪৩৫ জন, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়। তাদের প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দল জনপ্রিয় একটি ডেমোক্রেটিক ও অন্যটি রিপাবলিকান পার্টি। কেন্দ্র কখনোই রাজ্যের প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করে না। তারা নিজ দেশের গণতন্ত্রের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক। নির্বাচনের পূর্বেই অনেকটা জরিপের দ্বারা নির্বাচনের ফলাফল বুঝে নিতে পারেন। নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রশ্ন সহজে দেখা দেয় না।

অস্ট্রিয়া- প্রেসিডেন্ট শাসিত। সেখানে ৬ বছরের জন্য সরাসরি জনগন নির্বাচনে ভোট প্রয়োগ করে প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করে থাকেন। তাদের দেশে প্রধানত দুটি দল আছে। রক্ষনশীল ক্যাথলিকদের অষ্ট্রিয়ান পিপলস পার্টি ও উদারপন্থী সোসালিস্ট পার্টি। তারা নির্বাচনে একে অপরের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঠিকই কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে তাদের নির্বাচনের ফলাফলের বিজয়ী প্রার্থীকে মেনে নেওয়ার ও মানসিকতা বিরাজমান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অস্ট্রেলিয়া- এদেশ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র অনুযায়ী চলে। দেশের প্রকৃত শাসক প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রী পরিষদ। এটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চ কক্ষ ৬ বছরের জন্য, ৭৬ জন সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং নিম্নকক্ষ ১৪৮ সদস্য ৩ বছরের জন্য জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। গোপন ব্যালটের দ্বারা জনগণ ভোট দিয়ে তার প্রতিনিধি নির্ধারণ করে থাকেন।

আলজেরিয়া- ৫ বছরের জন্য সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এখানে নির্বাচনী আইনে ১৮ বছরের উর্ধ্বে সকলে ভোট দেওয়ার অধিকারী হন।

ইন্ডিয়া-তাদেরও লোক সভা এবং রাজ্যসভা নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত। লোক সভার সদস্য সংখ্যা ৫৪৪ এবং রাজ্য সভার সদস্য সংখ্যা ২৩৮। যারা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সকল কাজের জন্য লোক সভার কাছে দায়ী।

আবার চীনে ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর থেকে সেখানে নির্বাচনী সংস্কারের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু জাপানে আবার দেখা যায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। উচ্চকক্ষ ২৩০ এবং নিম্নকক্ষ ২১৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়।

অনুরূপ ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট শাসিত যা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হয়। তারপর উচ্চকক্ষে ৩২১ এবং নিম্ন কক্ষে ও ৫৭৭ জন সদস্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট সিকিউরিটি কাউন্সিল, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রশাসন গঠিত। এখানেও প্রেসিডেন্ট প্রধান শাসক। যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু লক্ষ্যনীয়, এ প্রেসিডেন্টে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ৩০০ আসনের প্রতিনিধিকে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হয়। ইরানে প্রেসিডেন্ট কয়েক জন সচিবমন্ডলীর দ্বারা দেশ পরিচালনা করে থাকেন। তাদের শাসনতন্ত্র ধর্ম শাসিত। এক কক্ষ মজলিসই সুরাইয় ইসলামী কর্তৃক দেশের শাসন কার্য পরিচালিত হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বে নির্বাচনের গুরুত্ব বেড়েই চলছে। আর তৎসঙ্গে চলছে সঠিক ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পন্থা আবিস্কারের কৌশল। যেখানে গণতন্ত্র সফল সেখানে নির্বাচনও সফল। কারণ গণতন্ত্র এবং নির্বাচন একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৭ নির্বাচনী সংস্কার ঃ

'সংস্কার' অতি পরিচিত একটি শব্দ। সংস্কার অনেক ধরনের অর্থ নির্দেশ করে যেমন শুদ্ধি, পরিস্করণ, মার্জন, ভুল সংশোধন। অবিধানে 'সংস্কার' শব্দের সাতাশটি ভিন্ন অর্থ ও প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে অনেক প্রয়োগই প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যজাত। সেই অর্থ থেকে অনেক সরে এসেছে আধুনিক প্রয়োগ, আমরা সংস্কার বলতে অধুনা যা বোঝাতে চাইছি সেটা পরিপাটিকরণ, পরিস্করণ, ক্ষালন, শুদ্ধি বা শোধন ইত্যাদি অর্থে প্রযোজ্য।[১২]

বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিতে "সংস্কার" শব্দটি স্থান করে নিয়েছে। একে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। অবিধান অনুযায়ী আমাদের রাজনীতিতে বর্তমানে যে সংস্কার বিতর্ক চলছে তার প্রয়োগ মূলত শুদ্ধি বা সংশোধন নির্দেশ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে নির্বাচনী সংস্কার প্রসঙ্গ এসেছে। নির্বাচন ব্যবস্থার নানা দূর্বলতার কারণে নির্বাচন হচ্ছে প্রশ্নবিদ্ধ। ফলে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক সংকট। গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনই সব কিছু নয় এ কথা সত্যি হলেও নির্বাচন দিয়েই এর যাত্রা শুরু। সংস্কার মানে 'মাইনাস ফর্মুলা' নয়, সংস্কার মানে ব্যবস্থার পরিবর্তন। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চর্চায় প্রধান সমস্যা হলো সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকতা। তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি এসেছে। দাবি এসেছে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির কাছ থেকেও। সচেতন প্রতিটি নাগরিকই অনুভব করে এদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীতা।

৬.৮ সংস্কার আন্দোলন ঃ

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের চাকা সচল রাখার জন্য সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন একটি গণ দাবি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হতেও তা উচ্চারিত হয়েছে। সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগিদের কাছ থেকেও আসছে নানা প্রস্তাব। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধ, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির চর্চা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এর জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের আন্দোলন তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে। যার শুরু আমরা লক্ষ্য করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তীতে ২০০৬-২০০৮ সালের দিকে তা আরো

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপকতা লাভ করে। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাও হয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ। নির্বাচন ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চেয়ে অন্যান্য বিষয়ে তাদের মনোযোগ বেশী আকর্ষন করেছে। সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক সংকট।

নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা নির্বাচন অনুষ্ঠানে তেমন কার্যকর হচ্ছিল না। অসৎ প্রার্থীগণ নিবাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করতেন। আইনের ফাঁক দিয়ে তারা নিস্তার পেয়ে যেতেন। ফলে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযাগ হ্রাস পেয়ে যায়। প্রয়োজন হয় নির্বাচনী আচরণ বিধির পরিবর্তন। সংস্কার করে কঠোর নির্বাচন আচরণ বিধি প্রণয়ন এবং তা পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করার উপর জোড় প্রদান করা হয়। বর্তমানে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রণয়নের কারণে ভোটার তালিকায় সংশোধন এসেছে। বিগত নির্বাচনগুলোতে ভোটার তালিকা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ফলে জনমনে দেখা দেয় অসন্তোষ। নির্বাচনী কেন্দ্র দখল ও জালভোট প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে উঠে ছিল। ফলে নির্বাচনী সন্ত্রাস ব্যাপক আকার ধারন করে। নির্বাচনী ব্যায়ের উপর নির্বাচন কমিশনের কোন নিয়ন্ত্রন ছিল না। নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার ছিল একটি সাধারণ বিষয়। ফলে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচনে আসার আগ্রহ কমে যায়। এছাড়া নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর অন্যতম কারণ নির্বাচন কমিশনের দূরবস্থা। অবস্থা এমন হয় যে, নির্বাচন কমিশনই যেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অন্তরায়। তাই সকল মহল থেকে নির্বাচন কমিশন পূনর্গঠনের কথা আসতে থাকে। সংস্কার নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয় তোলপাড়। আবার সংস্কার যেন দুর্বৃত্তায়নের হাতিয়ার না হয় সেদিকেও থাকতে হবে সচেতন।

৬.৯ সংস্কার প্রস্তাব ঃ

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নির্বাচনগুলোতে দুর্নীতির চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পরবর্তীতে এমন পর্যায়ে এসে পৌছে যে, জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নির্বাচনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শিক্ষিত সচেতন এবং বুদ্ধিজীবীরা নির্বাচনকে গণ্য করেছেন প্রহসন রূপে। তৎকালীন প্রতিটি নির্বাচনেই সরকারী দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সন্ত্রাস সৃষ্টি ও ভোট কারচুপির অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার প্রস্তাব ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান এবং তিনি না হলে সুপ্রীমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রধান বিচারপতি অথবা আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান বিচার বিভাগের রাজনীতিকরণ ও দলীয় করণের প্রবনতা সৃষ্টি করেছে।

শুধু বিচারকদের চাকরির বয়ঃসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ তে আকস্মিকভাবে উন্নীত করায় তা আরও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নির্দলীয় সরকারের দায়িত্ব অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করা ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করা এবং প্রয়োজন ব্যতীত কোনভাবেই কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা। বাস্তবতায় দেখা যায় আইনগত ক্ষমতার বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাই দাবি উত্থাপিত হয় যে,

(১) রাষ্ট্রপতি সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যদের নিয়োগ দান করবেন।

(২) সংসদীয় ব্যবস্থা মত রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে প্রধান উপদেষ্টার পরার্মশ অনুযায়ী কাজ করবেন।

(৩) প্রতিরক্ষা বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যাস্ত হবে।

(৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যপরিধি সংবিধান অনুসারে কেবল সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা প্রদানের মধ্যে সীমিত থাকবে।

(৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আগামী তিন টার্মের জন্য সীমিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার ঃ

(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ রাজনৈতিক দল সমূহের সাথে আলোচনা ক্রমে সসতা ও যোগ্যতার ভিতিত্তে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

(২) কমিশনারগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কাজ করবেন একাধিক মতের ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে।

(৩) নির্বাচন কমিশনের একটি স্বাধীন সচিবালয় থাকবে।

(৪) নির্বাচন কমিশন আর্থিকভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীন হবে।

(৫) নির্বাচন কমিশন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে।

(৬) নির্বাচনী আইন সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে।

(৭) নির্বাচনী আইন ও বিধি লঙ্ঘনের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা ও বাতিল করতে এবং প্রয়োজনে বিধি লঙ্ঘন কারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবে। এ জন্য ঐ সময়ে নির্বাচন কমিশনকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

(৮) ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল হবে এবং ভোটারদের ছবি ও ভোটার নম্বর সম্বলিত পরিচয়পত্র দিতে হবে, যাতে ভোটের দিন নির্বাচনী বুথ স্থাপন করতে না হয়। প্রবাসীদের ভোটার তালিকা অন্তর্ভুক্তি এবং ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করতে হব।

(৯) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে সর্বদলীয় পর্যবেক্ষণ দল গঠন করতে হবে। নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে তালিকাভুক্তি করতে হবে এবং নির্বাচন তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সরবরাহ করতে হবে।

(১০) আর্ন্তজাতিক পর্যবেক্ষক দলের বিষয় ও ন্যূনতম পক্ষে ভোট গ্রহণের একমাস আগে প্রকাশ করতে হবে এবং তাদের কার্য পরিধি ও নির্দিষ্ট থাকবে।

(১১) ভোট কেন্দ্রে সবার উপস্থিতিতে নির্বাচনী ভোট গণনা ও ফলাফলের স্বাক্ষরিত কপি প্রার্থী বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করবে।

(১২) নির্বাচনী ফলাফলের বিরোধের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে কোন মামলা দায়ের করা হলে দু'মাসের মধ্যে তার নিষ্পত্তি করা এবং সে সংক্রান্ত কোন আপিল সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের

Dhaka University Institutional Repository

বেঞ্চ কর্তৃক তিন মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করতে হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন নিজে পক্ষভুক্ত হয়ে মামলা নিস্পত্তির ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

নির্বাচনী আইন ও বিধির সংস্কার ঃ

(১) নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করা এবং এতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণ

(ক) প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য যারা যেভাবে ব্যয় করবেন তা প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে। প্রতি নির্বাচনী এলাকায় একজন নির্ধারিত কর্মকর্তা এই ব্যয় মনিটর করবেন এবং নির্বাচন কমিশনকে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করবেন। এই রিপোর্টের সঙ্গে প্রার্থীর দেয়া নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ মিলিয়ে দেখা হবে।

(খ) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রার্থী তার নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারিত ফরমে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে আইনে বর্ণিত শাস্তি (২-৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড) কঠোরভাবে বাস্ত বায়ন করতে হবে।

(গ) প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করতে উন্মুক্ত দলিল হিসাবে রাখতে হবে। প্রচার মাধ্যমেও তা নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইটে সরবরাহ করতে হবে। যে কোন ভোটার এ ব্যাপারে তাদের আপত্তি জানাতে পারবেন।

(ঘ) খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিলীকরণ করানো হলে খেলাপি কোন প্রাথী নির্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(ঙ) যথাযথ নিরীক্ষার পর অসত্য তথ্য প্রদানকারীদের নির্বাচন বাতিল হবে।

(২) প্রার্থীদের সম্পদ ও পরিচয় প্রকাশ ঃ

(ক) প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের আগে তার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ, কোন রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তার স্বার্থ জড়িত আছে কি না সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) হাই কোর্ট যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী প্রার্থীদের শিক্ষাগত, অন্যান্য যোগ্যতা ও কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কি না, সে তথ্য সহ অন্যান্য তথ্য প্রার্থীর মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

(গ) নির্বাচন কমিশন এসব তথ্য জনগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা করবে যাতে ভোটার বা প্রার্থীর যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্পর্কে অবগত থাকবেন।

(৩) প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ঃ

(ক) নিজে অথবা পরিবারের কেউ ঋণ খেলাপি হলে, কালো টাকার মালিক বলে বিবেচিত হবে।

(খ) সরকারি চাকুরি ব্যতায় ঘটিয়ে কোন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না।

(গ) স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতাকারী যুদ্ধাপরাধী হলে কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হাতে পারবে না। স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) দলের মনোনয়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তৃনমূল থেকে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামুলক করা মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য অর্থের লেনদেন রোধ করা।

(৪) রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ঃ

(ক) রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন ও প্রতি দুই বছর পর নিবন্ধন নবায়ন আইনগত ভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(খ) শুধু নিবন্ধিত দলই নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারবে।

(গ) নিবন্ধনের শর্ত হবে দলীয় গঠনতন্ত্রের নির্ধারিত পদ সমূহ নিয়মিতভাবে যথাযথ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা।

(ঘ) দলের তহবিল গঠন ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ এবং সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। প্রতি বছর দলের আয়-ব্যয়ের অডিট করা হিসাব কমিশনে দাখিল করতে হবে।

(ঙ) দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে অন্ততঃ পাঁচ বছরের দলীয় প্রাথমিক সদস্যপদ ও দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) কোন দল ক্রমাগতভাবে ৯০ কার্য দিবস সংসদ অধিবেশন বর্জন করলে দলের নিবন্ধন বাতিল হবে।

(৫) নির্বাচনী সন্ত্রাস রোধ করা ঃ

(ক) নির্বাচনে সর্ব প্রকার বল প্রয়োগ, অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা এবং বল প্রয়োগের ঘটনার কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে।

(খ) নির্দিষ্ট মেয়াদে ফৌজদারি দন্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

(গ) কোন রাজনৈতিক দল কোন সন্ত্রাসী ও কালো টাকার মালিককে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে না।

(৬) নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা রোধ করা ঃ

নির্বাচনে ধর্মের সর্বপ্রকার অপব্যবহার, সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রচারণা ও ভোট চাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। সম্প্রদায়িক প্রচারণা নিষিদ্ধ হবে। সংবিধান অনুযায়ী এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগ থাকবে। সংখ্যালঘুর উপর কোন অন্যায় অত্যাচার মেনে নেয়া হবে না।

(৭) সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এর লক্ষ্যে সবাই সমান সুযাগ পাবে ঃ

(ক) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ছয় মাস পূর্ব থেকে কোন দল বা প্রার্থী কোন নির্বাচনী এলাকায় কোন আর্থিক বা প্রকল্প গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিতে না পারে।

(খ) নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে সকল প্রকার, দেয়াল লিখন ও যত্রতত্র পোস্টার, লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদি লাগানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ষ্ট্যাগার্ড ভোটিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) ব্যালটে 'না' বাচক ভোটের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যদি না বাচক ভোট প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের বেশী হয় তবে পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) একজন ব্যক্তি একাধিক আসনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

(চ) ভূয়া প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কেউ ভূয়া প্রার্থী প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর ভূমিকা ঃ

(ক) নির্বাচনের নিরাপত্তা বিধান, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও নির্বাচনী আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী নির্বাচন কমিশনের ন্যাস্ত থাকবে এবং তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রন নির্বাচন কমিশনে থাকবে।

(খ) নির্বাচন কালে সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর দায়িত্ব এবং ক্ষমতা তা স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে এবং প্রয়োজনে তাদেরকে সে সময়ে কিছু বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

(১) নির্বাচনী বিরোধী দ্রুততার সাথে নিস্পত্তিকরণ ঃ

(ক) নির্বাচন-পূর্ব বিরোধ রিটার্নিং অফিসার/এসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিস্পত্তি করবেন, যার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের আপিল করা যাবে। কমিশন ১৫ দিনের মধ্যে আপীল নিস্পত্তি করবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

(খ) সুপ্রীম কোর্ট-অপ্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ গঠন করবে যাতে নিবাচনোত্তর বিরোধ/মামলা নির্ধারিত ছয় মাসের মধ্যেই চূড়ান্তভাবে নিস্পত্তি হয়।

নির্বাচনী সংস্কারের নারী প্রসঙ্গ ঃ

(ক) নারী আন্দোলনের নেত্রীরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানাচ্ছিলেন সংসদের নারী আসন বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের। এ ক্ষেত্রে নারীদের জন্য অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের এক তৃতীয়াংশ পদে নারী সদস্য রাখার বিধান কার্যকর করতে হবে।

(গ) বিগত নির্বাচনে ৭৩ থেকে ৭৪ শতাংশ নারী ভোট প্রদান করেছে। তারপরও এই নারীই শিকার হচ্ছে বৈষম্যের। তাই জাতীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১০ রোডম্যাপ ঃ

ফেব্রুয়ারী ২০০৭ এ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের পর আগামীতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য নির্বচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কমিশন কাজ শুরু করে। ২০০৬ সালে যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল, তা জনগণের কাছে গ্রহনযোগ্য হয়নি। এ ভোটার তালিকা পরে মাননীয় হাই কোর্ট বাতিল ঘোষণা করে। কমিশন বিস্তারিত পর্যালোচনার পর ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। এ জন্য কয়েকটি সম্ভ্যাব্য সময়সূচী ঘোষণা করে , যা সাধারনভাবে রোডম্যাপ নামে পরিচিত। এ রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০০৮ সালের ডিসেম্বর শেষে হওয়ার আগেই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন কমিশন এর রোডম্যাপ 469940

কাজ	শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ
নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন	**০৫-ফেব্রু-২০০৭**	**২৬-ডিসে-২০০৭**
কমিশনারদের নিয়োগ	০৫-ফেব্রু-২০০৭	১৪-ফেব্রু-২০০৭
অভ্যন্তরীন পুনর্গঠন	১১-ফেব্রু-২০০৭	২৬-ডিসে-২০০৭
নির্বাচনী সংস্কার	**১৮-ফেব্রু-২০০৭**	**২৭-ফেব্রু-২০০৮**
আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার	১৮-ফেব্রু-২০০৭	৩১-ডিসে-২০০৭
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনা	২৬-এপ্রি-২০০৭	৩১-ডিসে-২০০৭
গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা	২৩-মে-২০০৭	৩১-ডিসে-২০০৭
রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা	০১-সেপ্টে-২০০৭	২৮-নভে-২০০৭
আইনী সংস্কার অনুমোদন ও জারী	০৯-সেপ্টে-২০০৭	২৭-ফেব্রু-২০০৮
ভোটার তালিকা প্রণয়ণ	**০১-মে-২০০৭**	**১৬-অক্টো-২০০৮**
পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি নির্ণয়	০১-মে-২০০৭	৩০-জুন-২০০৭
শ্রীপুর পাইলট	৩১-মে-২০০৭	৩০-জুন-২০০৭
আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণে সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও বিন্যাস	০১-জুন-২০০৭	১৭-অক্টো-২০০৭
সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট	১১-জুন-২০০৭	০১-সেপ্টে-২০০৭
মাঠ পর্যায়ের কর্মীবাহিনী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ	০২-জুলাই-২০০৭	০৭-ডিসে-২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

উপাত্ত সংগ্রহ ও ডাটা এন্ট্রি	০৭-আগষ্ট-২০০৭	৩০-জুন-২০০৮
খসড়া ভোটার তালিকা মুদ্রণ, প্রকাশ ও সংশোধন	১৯-অক্টো-২০০৭	১৬-আগষ্ট-২০০৮
চূড়ান্ত তালিকা মুদ্রণ ও বিতরণ	১৮-আগষ্ট-২০০৮	১৬-অক্টো-২০০৮
নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ	**০১-জানু-২০০৮**	**৩০-জুন-২০০৮**
সীমানা নির্ধারণ	০১-জানু-২০০৮	৩০-জুন-২০০৮
নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়কাল	**১৬-ডিসে-২০০৭**	**৩১-ডিসে-২০০৮**
সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের নির্বাচন	১৬-ডিসে-২০০৭	৩০-ডিসে-২০০৮
ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন	১৬-ডিসে-২০০৭	৩১-ডিসে-২০০৮
উপজেলা নির্বাচন	০৩-নভে-২০০৮	৩১-ডিসে-২০০৮
সংসদীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়সূচী	**১৫-জুন-২০০৮**	**৩১-ডিসে-২০০৮**
রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের সর্বশেষ সময়সীমা	১৫-জুন-২০০৮	৩০-জুন-২০০৮
নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও সংসদ নির্বাচন	০১-জুন-২০০৮	৩১-ডিসে-২০০৮

উৎসঃ নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

৬.১১ তথ্যপুঞ্জী ঃ

১. প্রাগুক্ত, দেবাশিষ চক্রবর্তী, পৃ-১৭৬

২. অনাদিকুমার মহাপাত্র, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান। কলকাতা, ২০০২, পৃ-৮৫২

৩. বাংলা পিডিয়া

৪. প্রাগুক্ত, দেবাশিষ চক্রবর্তী, পৃ-১৭৫

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ঢাকা, ১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত, পৃ-১৯

৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৯

৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৯

৮. প্রাগুক্ত, পৃ-১০১

৯. বাংলা পিডিয়া

১০. বাংলা পিডিয়া

১১. বাংলাদেশ গেজেট, আরপিও, ফেব্রুয়ারী ২৪, ২০০৯

১২. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮

১৩. Jahan, Rounaq, "Bangladesh Politics: Problems and Issues" Dhaka: University press Ltd. 1980, p-200.

Maniruzzaman, Talukder, "The Bangladesh Revolution and Its Aftermath" p-218, 225, 227

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকা ঃ

৭.১ রাজনৈতিক দল ঃ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য রাজনৈতিক দল একটি অপরিহার্য উপাদান। দল হচ্ছে জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্ত রূপ। যে সকল ব্যক্তি/ নাগরিক একই ধরনের ভাবনা চিন্তা করে অভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করে এবং তা একই লক্ষ্যাভিসারী তারা মিলে দল গঠন করে। দল হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তিবর্গের সাথে সাধারণ নাগরিকদের যোগসূত্র স্থাপনকারী সেতুবন্ধন স্বরূপ। গণতন্ত্রে ব্যক্তির মতামতের মূল্য দেয়া হয়। আর ব্যক্তির মতামত প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে দল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও তার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য রাজনৈতিক দল থাকতেই হবে। গণতন্ত্রের হৃদপিন্ড হচ্ছে দল।প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার মানেই দলীয় সরকার।

গনতান্ত্রিক শাসন মানেই রাজনৈতিক দলের শাসন। গণতান্ত্রিক সরকারের সফলতা মূলত রাজনৈতিক দলের সফলতার উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগণের মধ্যে মিলন সৃষ্টি করে গ্রহণযোগ্য কর্মসূচী সৃষ্টি করে। যার মূল লক্ষ্য জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা। দলের মাধ্যমেই জনগণ সরকার গঠন করে, ভাঙ্গে এবং সরকারকে প্রভাবান্বিত করে। জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্রের বিকাশ অসম্ভব।

৭.২ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দল ঃ

রাজনৈতিক দলের সাথে নির্বাচন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাজনৈতিক দলই কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে ঐ কর্মসূচীকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে এবং সচেতন হয়ে উঠে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দল

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট এলাকায় প্রার্থী মনোনীত করে। প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের যোগ্যতম এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করে। ঐ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালায় রাজনৈতিক দলের কর্মীবৃন্দ। ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়াকে ব্যবহার করে জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। দলের কর্মসূচী জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিনে দলীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা দলীয় প্রার্থীর পক্ষে তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। ভোটদান, ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশের সময় দলীয় কর্মীরা সচেতনভাবে উপস্থিত থেকে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও সততা নিশ্চিত করে। প্রার্থীর জয় মানেই রাজনৈতিক দলের জয়। প্রার্থীর ব্যর্থতা মানে রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা। মূল্যবোধের কতৃত্বমূলক বন্টনই হল রাজনীতি। আর নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল সে কতৃত্ব লাভ করে। কাজেই নির্বাচন হল রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা লাভের একমাত্র বৈধ পথ।

৭.৩ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ঃ

পবিত্র সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাই বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক। গণতন্ত্রের স্বার্থে এখানে সুষ্ঠু দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠা অত্যন্ত জরুরী। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলো দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলের অবদান অনেক। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে দেশের শাসনভার কাধে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজের অবস্থান তৈরী করেছে। কর্তৃত্বের ভার নিলে ব্যর্থতার ভার নিতেই হবে। তাই জনগণের সকল আশা আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন না হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলো সমালোচনার মুখে পড়েছে। তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তথা রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা মানে আমাদেরই ব্যর্থতা। যথার্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের জন্য এবং আগামী বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হলে বাংলাদেশে দলীয় ব্যবস্থার উত্তম বিকাশ প্রয়োজন। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে এ অঞ্চলের মানুষের রয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল হল- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি, জামাত-ই-ইসলাম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ওয়ার্কাস পার্টি।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বহু রাজনৈতিক দল এখানে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ রাজনৈতিক দল নাম সর্বস্ব এবং গণসমর্থনহীন। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রত্যেক দলেরই রয়েছে স্বতন্ত্র আদর্শ, স্বতন্ত্র অঙ্গীকার এবং স্বতন্ত্র কর্মসূচী। কিন্তু জনগণের মাঝে এসব কর্মসূচীর চেয়ে নেতৃবর্গের ব্যক্তিত্বের সম্মোহীন ক্ষমতা বেশী প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতর ভাঙ্গন প্রবনতা বেশী। এছাড়া আন্তদলীয় কোন্দল, অবিশ্বাস এবং অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায়। এখানে জোটবদ্ধতা লক্ষ্যনীয়, যেমন ১৪ দলীয় জোট, চারদলীয় জোট ইত্যাদি। এ জোটগুলো সর্বদা একে অন্যের বিপরীতে অবস্থান করে। বড় কয়েকটি দল ছাড়া অন্য দলগুলোর সাংগঠনিক ভিত্তি গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা দেখা যায় না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

বাংলাদেশে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল হল- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। আওয়ামী লীগ প্রায় ৬০ বছরের পুরোনো দল। অসাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বকারী একটি দল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেও যে এদলকে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি তার একটি অন্যতম কারণ হলো দলটি মাটির মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই দেশে গনতন্ত্র বিকাশের স্বার্থেই এ রকম একটি দলের প্রয়োজন রয়েছে।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর প্রায় ৩০ বছর পরও বিএনপি বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত এ সংগঠনটি। তাদের কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এটি একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। মূলত এ দুটি রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৪ বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ঃ

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা হলো নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার। প্রধান দুই দলের বাইরে অন্যান্য দলও এ বিষয়ে সক্রিয়। আশির দশকের প্রায় শুরু থেকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের ফলে সামরিকতন্ত্রের পতন ঘটে নব্বইয়ে। নব্বইয়ের মুক্ত নির্বাচন আন্দোলন এর সঙ্গে মানুষ বেরিয়ে পড়েছিল গণতন্ত্রের অভিযাত্রায়ও। রাজনৈতিক দলগুলোর দাবিই ছিল রাজনীতিতে গুনগত পরিবর্তন আনা। নব্বইকে যদি ধরে নেওয়া হয় গণতন্ত্রের ফিরে আসা, পরবর্তী সময়টা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার সময়। দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, দলীয়করণ ইত্যাদির ফলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। এই অবস্থা থেকে রাষ্ট্র ও সমাজকে মুক্ত করতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং নির্বাচনকে কালো টাকা, সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের রূপরেখায় ২০০৫ সাল থেকে আন্দোলন গড়ে উঠে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনী সংস্কারের যে প্রস্তাব সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছে তার কোনটাই ঐ সংস্কার প্রস্তাব থেকে খুব একটা পৃথক নয়। এমনকি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহকে গণতান্ত্রিক বিধিবিধানের ভিত্তিতে পরিচালনা করা, দলের কর্মকর্তাদের নিয়মিত নির্বাচন ও দলের আর্থিক বিবৃতি পেশের কথাও আন্দোলনের ঐ সংস্কার প্রস্তাবে ছিল। নির্বাচনী সংস্কারের পাশাপাশি রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থবহ পরিবর্তন আনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল।

রাজনৈতিক দলগুলো একটি কথা সর্বদাই বলে আসছিল যে, রাজনীতি কিংবা নির্বাচনী যে কোন সংস্কারের কথাই বলা হোক না কেন, জনগণের উপর নির্ভর করে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সেটা করতে হবে অন্য কোনভাবে নয়।

সকল দলেই নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের চিন্তা ঃ-

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্বাচনী আইন সংস্কারে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ প্রথম আলোকে বলেছেন নির্বাচন কমিশন নিয়ে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি

Dhaka University Institutional Repository

ছিল একথা সত্য। এসব ত্রুটি সারাতে সংস্কার করতেই হবে। বিএনপির তৎকালীন যুগ্ম মহাসচিব সংস্কারের গুরুত্ব স্বীকার করেন।[১] আওয়ামীলীগের তৎকালীন সভাপতি মন্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমদ নির্বাচন কমিশনের সংস্কার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এ ধরনের সংস্কার প্রয়োজন আছে।[২] বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কার উদ্যোগের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন ১৪ দলের সংস্কার রূপরেখায় এসব সংস্কারের কথা বলা আছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে নির্বাচন প্রক্রিয়া অনেক স্বচ্ছ হবে। তিনি নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন ভূমিকা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[৩] জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ.এম এরশাদ বলেছেন, নির্বাচন কমিশন যে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে তা যুক্তিযুক্ত। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যতটুকু সময় দরকার নির্বাচন কমিশন ততটুকু সময়ই নেবে। জামায়াত ই- ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদও একই কথা বলেন।[৪]

নির্বাচনী আইন সংস্কারের বিষয়ে বিএনপি ও আওয়ামীলীগ এর মনোভাব ঃ

আলোচনার মাধ্যমে সংস্কার করলে মানবে বিএনপি ঃ

আলোচনার মাধ্যমে যদি নির্বাচন কমিশন কোন সংস্কারের উদ্যোগ নেয় তাহলে তা মানবে বিএনপি। দলটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন উত্থাপিত খসড়া সংস্কার প্রস্তাবের অনেক বিষয়ে একমত হলেও একে পূর্ণাঙ্গ মনে করে না দলটি। নির্বাচন বিষয়ক সংস্কারের ক্ষেত্রে বিএনপি মনে করে নির্বাচন কমিশনকে আরোও শক্তিশালী করে এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা ও সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র করে অল্প সময়ের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব।[৫] আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনের খসড়া সংস্কার প্রস্তাবকে সঠিক বললেও এগুলো পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করে। দলটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা ও দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপর জোড় দেয়। দলটি মনে করে নিজস্ব লোকবল ও অর্থবলের মাধ্যমে কমিশন স্বাধীন হতে পারে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে আলাদা করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের উপর নির্বাহী বিভাগের খবরদারি থাকলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধাগ্রস্ত হবে। কমিশনের

Dhaka University Institutional Repository

লোকবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির ক্ষমতা থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি স্বাধীন না হলে যত আইনই করা হোক তা অকার্যকর হয়ে যাবে।[৬]

আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দলগুলোর নির্বাচন সংস্কার প্রস্তাব ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের প্রস্তাবনা। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার-

১) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রতিবেদনে ও অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের অবশ্যিকতা ঘোষিত হয়েছে। নব্বইয়ের গণ আন্দোলন জনগণের ওই দাবিকে বাস্তবে রূপ দিতে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ঐ নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য ঐ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দলীয় নিরপেক্ষ চরিত্র নিশ্চিত করে তিন জোটের ঘোষণা সুনির্দিষ্ট বিধান করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে দুই জাতীয় সংসদের অন্তর্বর্তীকালীন সময় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়। নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য কালো টাকা, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত করার জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিও সে সময় উত্থাপিত হয়। ঐ দাবিকে উপেক্ষা করে বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী একটি ভোটারবিহীন একদলীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত জাতীয় সংসদ ও সরকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বৈধতা লাভে ব্যর্থ হলে গণআন্দোলনের চাপে ১২ দিন স্থায়ী ঐ সংসদে সংবিধানে সংশোধন করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২) দেশব্যাপী তীব্র গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ঐ তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে সক্ষম হলেও সংবিধানের ঐ সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্তর্কালীন শাসনামলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার নানাবিধ সংকট ও সমস্যা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা দৃশ্যমান হয়ে উঠে। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির দুটি ক্ষেত্র ছাড়া সমুদয় কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে করে থাকেন। কিন্তু সংবিধানের ঐ বিধানে রাষ্ট্রপতিকে

Dhaka University Institutional Repository

এমন কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যা সংসদীয় পদ্ধতির মূল চেতনার পরিপন্থী। এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় দ্বৈত কাঠামো তৈরী হয়েছে যা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘাতের জন্ম দিতে পারে। রাষ্ট্রপতির হাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ন্যাস্ত থাকা এর অন্যতম। অন্যদিকে নির্দলীয় সরকারের রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকার বিধানটি সংবিধানের পরিপন্থী এবং ঐ সময় কালে রাষ্ট্রপতিকে একক ক্ষমতার অধিকারী করে।

৩) বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার বিবেচনায় স্বৈরাচারী ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রের উত্তরনের জন্য প্রধান করা হয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান এবং তিনি না হলে সুপ্রিমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রধান বিচারপতি অথবা আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্যে থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান বিচার বিভাগের রাজনীতিকরণ ও দলীয়করণের প্রবণতা সৃষ্টি করেছে। শুধু বিচারকদের চাকরির সময়সীমা ৬৫ থেকে ৬৭ তে আকস্মিকভাবে উন্নীত করা তাই প্রমাণ করেছে। বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও তার স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে তালবাহানা বিচারপতি নিয়োগে দলীয় বিবেচনা বিচার সম্পর্কেও প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। তদুপরি পদাধিকার বলে কাউকে কোনো নিযুক্তি প্রদান অনেক সময় যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে। এ ব্যবস্থাকে আরো উপযুক্ত, দক্ষ ও কার্যকর করার জন্য প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রটি কেবল বিচার বিভাগের পরিমন্ডল থেকে বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

৪) সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নির্দলীয় সরকারের দায়িত্ব অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করা ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করা এবং প্রয়োজন ব্যতীত কোনভাবেই কোন নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা। কিন্তু ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেবল নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেনি তারা তাদের আইনগত ক্ষমতার বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে ও সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রন আরোপের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৫) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সংস্কারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণ কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত কোনো সংগঠনের সদস্য হবেন না। সর্বোপরি প্রধান উপদেষ্টাকে সব রাজনৈতিক দলের আস্থাভাজন হতে হবে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবিধানিক

Dhaka University Institutional Repository

ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে সংবিধানের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানকে জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জনগণের সেই দাবি অনুযায়ী-

১) রাষ্ট্রপতি সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যদের নিয়োগদান করবেন।

২) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে বিবেচনায় রেখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধানকালীন সময়েও রাষ্ট্রপতি সব বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

৩) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেয়াদকালীন সময় প্রতিরক্ষা বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যাস্ত হবে এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত হবে।

৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যপরিধি সংবিধান অনুসারে কেবল সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা প্রদানের মধ্যে সীমিত থাকবে।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার ঃ-

একটি স্বাধীন ও কার্যকর নির্বাচন কমিশনই অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে। সে লক্ষ্যে '৯০ এর তিন জোটের ঘোষণায় নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য সেই ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের পূণর্গঠনের কথা বলা হয়েছিল। নির্বাচনী আইন ও বিধির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন ও সংযোজন করা হলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল না । যার ফলে স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ফলে নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশন নির্বাহী বিভাগের কাছে অসহায় থাকে। এ অবস্থায় নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে-

১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২) কমিশনারের সাধারণ নিয়মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই কাজ করবে। তবে একাধিক মতামতের ক্ষেত্রে সংখ্যাবিধ ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে।

৩) নির্বাচন কমিশন একটি স্থায়ী সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বিধায় এর প্রতি তদ্রুপ মান্যতা ও মর্যাদা পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রনসহ সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে নির্বাচন কমিশন কাজ করতে পারবে।

৪) নির্বাচন কমিশনের একটি স্বাধীন সচিবালয় থাকবে। নির্বাচন কমিশনের সচিবালয় হবে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রনমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা। নির্বাচন কমিশনই উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃত করবে এবং তার কর্মচারী কর্মকর্তা নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রন করবে। নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনকে তার চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক জনগণ সরকার সরবরাহ করবে।

৫) নির্বাচন কমিশন আর্থিকভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীন হবে এবং এ জন্য বাজেটসমূহ তহবিলের দায়মুক্ত ব্যয়ের বিধান অনুযায়ী সরাসরি বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

৬) নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ও নির্বাচনে নিরাপত্তার জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন থাকবে এবং এ ব্যাপারে সরকার তার অনুরোধ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকবে।

৭) নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত বাহিনী নির্বাচনের আগে ও পরে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে নির্বাচন কমিশনের অধীন থাকবে এবং ঐ সময় কালে তাদের দ্বারা কৃত কোনো অপরাধ ও কর্তব্য অবহেলার জন্য নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষনিকভাবে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং সরকার তা বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

৮) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা ও নির্বাচন বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে।

৯) নির্বাচনী আইন ও বিধি লঙ্ঘনের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা ও বাতিল করতে পারবে এবং ঐ আইন ও বিধি লঙ্ঘনকারীদের আটক করার জন্য আদেশ ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারবে। এ জন্য ঐ সময়কালে নির্বাচন কমিশনকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

১০) ক) ভোটার জরিপ প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা রাখতে হলে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি করার ব্যবস্থাসহ ভোটার তালিকা প্রতিনিয়ত নবায়ন করার স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কম্পিউটারাইজড ভোটার তালিকা ও ভোটারদের জন্য আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। ইলেকট্রনিক্স ভোটিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

খ) পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী পাবর্ত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

গ) প্রবাসীদের ভোটার তালিকা অন্তর্ভুক্তি এবং ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে সর্বদলীয় পর্যবেক্ষণ দল গঠন করবে। জাতীয় ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের মূল্যায়ন নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং এই পর্যবেক্ষকদের তালিকা নির্বাচন তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সরবরাহ করতে হবে। এসব পর্যবেক্ষণ কোনক্রমেই ভোট কক্ষ বা বুথে যাবে না।

১২) আর্ন্তজাতিক পর্যবেক্ষক দলের বিষয় ও ন্যূনতম পক্ষে ভোট গ্রহণের একমাস আগে প্রকাশ করতে হবে এবং তাদের কার্যপরিধি ও নির্দিষ্ট থাকবে।

১৩) ভোট গ্রহণের জন্য প্রতি বুথে স্বচ্ছ ভোট বাক্সের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের নাম্বারিং থাকতে হবে।

১৪) ভোট কেন্দ্রে সবার উপস্থিতিতে নির্বাচনী ভোট গণনা ও ফলাফলের স্বাক্ষরিত কপি প্রার্থী বা তার মনোনীত প্রার্থী এবং নির্ধারিত পর্যবেক্ষকদের প্রদান করবে। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনের ফলাফলের কনসলিডেটেড বিবরণী নির্বাচন কমিশনকে প্রেরণ করবেন এবং কেবল নির্বাচন কমিশনই নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করবে।

১৫) নির্বাচনী ফলাফল বিরোধের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কোন মামলা দায়ের করা হলে দু'মাসের মধ্যে তার নিস্পত্তি করা এবং সে সংক্রান্ত কোন আপিল সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের বেঞ্চ কর্তৃক তিন মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করতে হবে। এ বিষয়েও নির্বাচন কমিশন নিজে পক্ষভুক্ত হয়ে মামলা নিস্পত্তির ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী আইন ও বিধির সংস্কার ঃ-

১) নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করার জন্য ঃ-

ক) প্রার্থী বা প্রার্থীর খেলা পক্ষে অন্য যারা যেভাবে ব্যয় করুন তা প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে এবং তা কোনো ক্রমে নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা লঙ্ঘন করবে না। প্রতি নির্বাচনী এলাকায় একজন নির্ধারিত কর্মকর্তা এই ব্যয় মনিটর করবেন এবং নির্বাচন কমিশনকে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করবেন। এই রিপোর্টের সঙ্গে প্রার্থীর দেয়া নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ মিলিয়ে দেখা হবে।

খ) প্রার্থীর নির্বাচন আয়-ব্যয়ের বিবরণ সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করতে উন্মুক্ত দলিল হিসেবে রাখতে হবে এবং প্রচার মাধ্যমকে তা সরবরাহ করতে হবে। যে কোনো ভোটার এ ব্যাপারে তাদের আপত্তি জানাতে পারবেন।

গ) নির্বাচনী কাজে আয়-ব্যয়ের হিসাব এক মাসের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তা করতে না পারলে ঐ নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে।

ঘ) খেলাপী ঋণ পুনঃ তফসিলীকরণ করা না হলে ঋণ খেলাপী কোনো প্রার্থী নির্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ঋণ খেলাপির জামিনদারও অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২) প্রার্থীদের সম্পদ ও পরিচয় প্রকাশ ঃ-

ক) প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের আগে তার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ কোনো রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তার স্বার্থ জড়িত আছে কিনা সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে হবে।

খ) হাইকোর্ট যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী প্রার্থীদের শিক্ষাগত, অন্যান্য যোগ্যতা ও কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা, সে তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য প্রার্থীর মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

গ) নির্বাচন কমিশন এসব তথ্য জনগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা করবে যাতে ভোটার বা প্রার্থীর যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্পর্কে অবগত থাকবেন।

৩) প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ঃ

ক) নিজে অথবা পরিবারের কেউ ঋণ খেলাপি হলে, কালো টাকার মালিক বলে বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) সরকারি চাকুরি বিধির ব্যাত্যয় ঘটিয়ে কোনো সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনী প্রার্থী হতে পারবেন না।

গ) স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতাকারী যুদ্ধাপরাধী হলে কেউ নির্বাচনের প্রার্থী হতে পারবে না। স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য হবে।

ঘ) দলের মনোনয়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তৃণমূল থেকে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা, দলের অভ্যন্তরে গনতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসরণ এবং মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য অর্থ দ্বারা প্রভাবিত করার ঘটনা কার্যকরভাবে রোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) নির্বাচনকে সন্ত্রাস, পেশীশক্তির প্রভাব ও দুর্বৃত্তমুক্ত করতে ঃ-

ক) নির্বাচনে সর্বপ্রকার বল প্রয়োগ, অস্ত্র বহণ ও প্রদর্শন পরিপূর্ণ নিষিদ্ধ করা এবং বল প্রয়োগের ঘটনার কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে।

খ) নির্দিষ্ট মেয়াদে ফৌজদারি দন্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

গ) কোনো রাজনৈতিক দল কোনো সন্ত্রাস ও কোনো টাকার মালিককে মনোনয়ন প্রদান করবে না।

৫) নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার ঃ-

ক) নির্বাচনে ধর্মের সর্বপ্রকার অপব্যবহার, সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রচারনা ও ভোট চাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। সাম্প্রদায়িক প্রচারণা নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬) নির্বাচনে সবার সম সুযোগ দান ঃ

ক) পোস্টার, লিফলেট, বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপন ব্যবহার, মাইক, নির্বাচনী ব্যানার, দেয়াল লিখন, গেট নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে যে সব নিয়ন্ত্রনমূলক ব্যবস্থা আছে তা ব্যতিক্রমহীনভাবে পালন করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তা এ বিষয়ে নিশ্চিত করবেন এবং এ ক্ষেত্র কোনো প্রকার আইন ও বিধি ভঙ্গ করা হলে তাৎক্ষনিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবেন।

খ) নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় সভার ব্যবস্থা করবে।

গ) নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দিন থেকে সব দলের কেন্দ্রীয় সমাবেশ, মহাসমাবেশ, র‍্যালি, জনসভার ব্যয় কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) নির্বাচনী এলাকা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রচলিত আইন অনুযায়ী নির্বাচিত অফিস ব্যতিরেকে কোনো নির্বাচনী ক্লাব, ক্যাম্প, নির্বাচনী প্রচার বেশ হিসেবে কোনো কাঠামো তৈরি করা যাবে না।

ঙ) এসব প্রতিটি বিষয়ে নির্বাচনে কমিশনের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং লঙ্ঘণকারীদের প্রার্থীতা বাতিল করতে হবে।

৭) নির্বাচন পরিচালনা দক্ষতা বিধান ঃ-

ক) নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিয়োগকৃত প্রিসাইডিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের তালিকা নির্বাচনের ১৫ দিন আগেই প্রার্থীদের সরবরাহ করতে হবে, যাতে এ বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নির্বাচনের আগেই নিস্পত্তি করা যায়।

খ) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা ও একইভাবে ১৫ দিন আগে প্রকাশ করতে হবে। জনগণকে অবহিত করতে উভয় বিষয়েই স্থানীয়ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর ভূমিকা ঃ-

ক) নির্বাচনের নিরাপত্তা বিধান, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও নির্বাচনী আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে নির্বাচনের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী নির্বাচন কমিশনে ন্যাস্ত করতে হবে এবং তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রন নির্বাচন কমিশনের থাকবে।

খ) আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সংজ্ঞা পরিবর্তন ও তাদের বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করে এর আগেকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৭২ সালের পিত্ত নং- ১৫৫ তে বিধি ৮৭ এবং ৮৯ এর মাধ্যমে পরিবর্তন সাধন করেছে, তা বাতিল করতে হবে এবং ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধির আদেশ ও ১৯৯১ সালের নির্বাচনী আইন অনুযায়ী নির্বাচনকালে সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর দায়িত্ব ক্ষমতার যে এখতিয়ার ছিল, তা পূণর্বহাল করতে হবে।

৯) রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীন গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করা ঃ-

ক) নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতান্ত্রিক বিধি বিধানের ভিত্তিতে ও পরিচালনা দলের কর্মকর্তাদের নিয়মিত নির্বাচন দলের আর্থিক বিবৃতি নির্বাচন কমিশনকে প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

খ) নির্বাচন কর্তৃক নির্বাচনের ব্যাপারে রাজনৈতিক কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১০) রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ ঃ-

ক) নির্বাচন আচরণ বিধি যা রয়েছে, তা কঠোর ভাবে প্রয়োগ এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে তার জন্য সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ে সর্বদলীয় পরামর্শ কমিটি গঠন করতে হবে।

১১) সংরক্ষিত মহিলা আসনে আসন বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ.এম এরশাদ এর প্রস্তাব ঃ

প্রস্তাবিত নির্বাচন পদ্ধতি ঃ-

১) জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা হবে ৩০০। জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাব অনুসারে দেশে জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ থাকবে। সেহেতু জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ৩০০ থাকলেই যথার্থ হবে।

২) প্রত্যেক রাজনৈতিক দল সামর্থ অনুসারে প্রার্থী মনোনিত করে নির্বাচন কমিশনে তালিকা পেশ করবে।

৩) তালিকার সাথে প্রত্যেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা থাকবে।

৪) একই প্রার্থী একাধিক দলের তালিকায় থাকলে তার প্রার্থীতা বাতিল হবে।

৫) প্রত্যেক দল নির্ধারিত কোটা অনুসারে প্রার্থী তালিকা তৈরী করবে।

৬) প্রার্থী তালিকার কোটা হবে নিম্নরূপ ঃ-

(ক) সাধারণ ৫০%

(খ) মহিলা ৩০%

(গ) সংখ্যালঘু ১০%

(ঘ) পেশাজীবী ১০%

৭) সাধারণ প্রার্থী কোটায় যে কোন প্রার্থী থাকতে পারবেন। পেশাজীবী কোটায় থাকবেন শিক্ষক-আইনজীবী-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক-শিল্পপতি-ব্যবসায়ী-শ্রমিক নেতৃত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

৮) প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন নির্ধারন করবে কোন দল কোন কোটায় কত আসন লাভ করবে। যে দল সর্বাধিক ভোট পাবে, সে দলই ভগ্নাংশের সুযোগ লাভ করবে। অর্থ্যাৎ কোন দল কাস্টিং ভোটের ১ শতাংশ ভোট পেলে ৩টি আসন পাবে। ১ দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত ভোট পেলে ৪টি আসন লাভ করবে। অবশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগফলের সুবিধা সার্বিক ভোট প্রাপ্ত দল ভোগ করবে।

৯) নির্বাচন কমিশন নির্ধারন করবে কোন আসনে কোন দলের প্রার্থী প্রতিনিধিত্ব করবেন। সে ক্ষেত্রে দলের প্রাপ্ত ভোটাধিক্য প্রথম বিবেচনা হিসেবে গন্য করা হবে।

১০) কোন দলের প্রতিনিধি মৃত্যুবরণ কিংবা পদত্যাগ করলে অথবা দল থেকে বহিস্কৃত হয়ে সংসদ প্রতিনিধি পদ হারালে ঐ আসনে কোন উপনির্বাচন হবে না। সংশ্লিষ্ট দল তাদের প্রার্থী তালিকা থেকে নতুন প্রতিনিধি মনোনয়ন দেবে। নির্বাচন কমিশন তাকেই সংসদ প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত ঘোষণা করবে।

১১) স্থানীয় সরকার নির্বাচন কোন দলীয় ভিত্তিতে হবে না। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন। এখানে সরাসরি প্রার্থীরাই নির্বাচন করবে।

১২) যে কোন নির্বাচনে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকার বলে দায়িত্ব পালন করবে এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫ সিভিল সোসাইটি

'সিভিল সোসাইটি' ব্যাপারটি বিশ্বব্যাপী মতবিনিময়কারী ব্যক্তিবর্গের ভিতরে একটা পছন্দনীয় কথা হয়ে উঠেছে। সিভিল সোসাইটির উল্লেখ না করে আজকের দিনে রাজনীতি বা সরকারি নীতিমালা নিয়ে কথা বলা কঠিন। পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন (১৯৮৯) ও তৎপরবর্তী জাতি গঠন ও গঠনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা বিশ্বায়নের এই যুগে সামাজিক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সিভিল সোসাইটি প্রত্যয়টি নব্বই এর দশকের শুরু থেকেই বাংলাদেশের তাত্ত্বিক ও গবেষকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দাতাগোষ্ঠীর সাহায্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আর্ন্তজাতিক মহল থেকে এর বিকাশ বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

সম্প্রতি সিভিল সোসাইটি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলেও এর অনেক বাংলা প্রতিশব্দ রয়েছে। কেউ কেউ এর বাংলা করেছেন সুশীল সমাজ, কেউ কেউ নাগরিক সমাজ আবার কেউ কেউ সিভিল সমাজ। সিভিল সমাজকে নাগরিক সমাজ নামেও আখ্যা দিয়েছেন অনেকে। ব্যবহৃত হয় সিভিল সোসাইটি শব্দটিও। বস্তুত এ তিনটি শব্দের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।[৭] বর্তমানে সিভিল সোসাইটি শব্দটিও যথেষ্ট পরিচিত। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাহক হিসেবে সুসংগঠিত সিভিল সোসাইটির প্রয়োজন সর্বমহলে স্বীকৃত হয়েছে।

মধ্যযুগ উত্তর হবস্‌বাদ উত্তর ও আধুনিককালে সিভিল সোসাইটির ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন মত পার্থক্য দেখা গেলেও এই ধারনাটির বিকাশ সপ্তদশ শতকে জন লক ও হ্যারিংটনের আলোচনার মাধ্যমে।[৮] পরবর্তীতে ফারগুসন ও স্মিথ, রুশো ও হেগেল এবং টকিয়াভিলের আলোচনার মাধ্যমে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ডিসকোর্সে পরিণত হয়। অনেক তাত্ত্বিকই একে "ছাতা সদৃশ্য" ধারনার সাথে তুলনা করেছেন যা রাষ্ট্রের বাইরে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। জন লক রাষ্ট্রকে সিভিল সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের একীভূত প্রতিষ্ঠান হিসেরে দেখেছেন। পরবর্তীতে রুশোও একই ধারনা পোষন করেছেন।[৯] হেগেল বুর্জোয়াদেরকেই সিভিল সমাজ হিসেবে দেখেছেন। কার্ল মার্কস ও গ্রামসি সিভিল সমাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। মার্কস এর মতে সিভিল সমাজ হচ্ছে মূলত বুর্জোয়া সমাজ এবং যেখানে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিপরীতে ব্যক্তি স্বার্থই প্রাধান্য পায়। গ্রামসির

Dhaka University Institutional Repository

মতে সিভিল সমাজ হলো একক ধরনের সংগঠন ও টেকনিক্যাল মাধ্যম যার উপর ভিত্তি করে শাসক সমাজ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাদের আদর্শিক মতাদেশে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। ফরাসি চিন্তাবিদ টকিয়াভিলে সিভিল সমাজের প্রাধান্য স্বীকার করে বলেন যে, "রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে সিভিল সমাজই ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে এবং সিভিল সমাজ তার অধিকার রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে।[১০] মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায় সামরিক শাসক বা সামরিক সমাজের বিপরীতে রাষ্ট্রে, সমাজে নিরস্ত্র মানুষের কর্তৃত্বই মূলত সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা। [১১]

২৪ জুলাই ৯৭ এনজিও আয়োজিত সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন :- A civil society represnts the ordinary members of a society. [১২] সকল বিতর্ক পিছনে ফেলে একুশ শতকে সিভিল সোসাইটি হয়ে উঠেছে গণতন্ত্র রক্ষা ও সরকারের উপর কার্যকর নজরদারির একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে সিভিল সোসাইটি ধারনার সাথে পুঁজিবাদী সমাজের বাজার অর্থনীতির ধারণা জড়িত। তাই বলা যেতে পারে পরিবার রাষ্ট্র ও বাজার এর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় জনস্বার্থে যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি কর্তৃক। তারাই সিভিল সমাজ।[১২]

৭.৬ বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ঃ

বাংলাদেশী গবেষকদের কাছে সিভিল সোসাইটি হচ্ছে বেসরকারি অলাভজনক অরাজনৈতিক সংগঠন, যা জনগণের স্বার্থের পক্ষে কাজ করে। তাই প্রেস, মিডিয়া, শ্রমিক সংগঠন, ধর্মীয় ও পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ সবই সিভিল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত।[১৩]

অন্যদিকে সিভিল সোসাইটি হচ্ছে রাষ্ট্র, বাজার ও রাজনৈতিক দলগুলোর বাহিরে জনগণের বা কোন গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ কোন কার্যক্রম। কেননা উপরোক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানই একক বা সংঘবদ্ধভাবে সকল ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করে। তাই রাষ্ট্র, বাজার ও রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একদিকে অবস্থান করে আর অন্যদিকে থাকে সাধারণ জনগণ। অতএব "The Society of the common masses is civil society"|

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে কর্পোরেট বাজার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে সিভিল সোসাইটির বাইরে রাখা যায়। কিন্তু এনজিও সিভিল সোসাইটির অংশ।

অতএব, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সিভিল সোসাইটি হল যে সকল প্রতিষ্ঠান যা একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। যেখানে ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে ভলান্টরি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে ও গনসচেতনতা, জনমত তৈরি এবং সরকারের দমনমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরীতে সচেষ্ট থাকে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরী ও গণআন্দোলন তৈরীর প্লাটফর্ম হিসেবে সিভিল সোসাইটি কাজ করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, পাকিস্তান আমলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সিভিল সোসাইটি জড়িত ছিল। বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন বা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি যদিও প্রধানত রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত তথাপি এর সাথে সিভিল সোসাইটির ভূমিকাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই।

(১৯৮১-১৯৯০) সময়কালটি সিভিল সোসাইটির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন সামরিকতন্ত্র বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শ ও গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সিভিল সমাজ অগ্রনী ভূমিকা রাখে এবং ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক সক্ষমতা অর্জন ও বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যুতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে এনজিওদের বিকাশ ঘটে। তিন দলীয় রাজনৈতিক ঐক্য জোট এবং সম্মিলিত সিভিল সমাজের সক্রিয় ভূমিকার কারণেই প্রেসিডেন্ট এরশাদকে পদত্যাগ করতে হয়। সে সময় শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন, আইনজীবী সমিতি, ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক-কর্মচারী পেশাজীবী সমিতি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, মহিলা সমিতি নারী অধিকার সমিতি, নারীমুক্তি সমিতি, আইনানুগ সাহায্য সংস্থা, ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সোচ্চার হয়। ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং অবাধমুক্ত ও সুষ্ঠু নির্বাচন মনিটরিং করার জন্য গঠিত হয়েছিল বাঁচতে শিখা ডেমোক্রেসি ওয়াচ, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এজেন্সী প্রভৃতি।[১৪] আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বৈদেশিক সাহায্যদাতা প্রতিষ্ঠান সমূহ তৃতীয় বিশ্বের এনজিওদের সরাসরি বা সরকারের মাধ্যমে ফান্ড সরবরাহ শুরু করে, যা সিভিল সোসাইটির ক্ষমতায়ন হিসেবে চিহ্নিত হয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, (১৯৮৮-৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

সালে উন্নয়নের নামে বাংলাদেশে আসা বিদেশী অর্থের ৬ ভাগ পেত এনজিওরা, বর্তমানে সেই হার ১৭ ভাগে উন্নীত হয়েছে। [১৫]

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও আব্দুল্লাহ আবু সাইদের মতো দেশ বরেণ্য সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি এখন তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো সিভিল সোসাইটির সরকার।[১৬] তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক সচেতনতা, অধিকমাত্রায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য ফেমা (FEMA). অধিকার (ODHIKAR), CCHRB এবং CAC এর মত বিভিন্ন নির্বাচনী মনিটরিং সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে টিআইবি (TIB) সিপিডি (CPD) এর মত প্রতিষ্ঠানগুলো জনমত গঠন ও সরকারের উপর নজরদারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার প্রসারের ফলেও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

৭.৬ বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া জোরদারে সিভিল সোসাইটি ঃ

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র এক জরুরী অনুষঙ্গ। আর গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রয়োজন সামাজিক সংগঠনগুলোর সক্রিয়তা, রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতর সমঝোতা। গণতন্ত্রের মান উন্নয়নের জন্য চাই নাগরিক সমাজের বিকাশ। গণতন্ত্রের অন্যতম বিষয় নির্বাচনকে করতে হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিক সমাজের ভূমিকাকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোন থেকেই বিচার করা হচ্ছে। ল্যারী ডায়মন্ড (১৯৯১) গণতন্ত্রকে পুষ্ট করার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের অন্তত ছয় ধরনের অবদানের কথা বলেছেন।[১৭]

১. রাষ্ট্রের বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক শক্তির দরকার পড়ে তা নাগরিক সমাজের মধ্যে রয়েছে।

২. নাগরিক সমাজের ভেতরে যে বৈচিত্র রয়েছে তার কারণেই রাষ্ট্র মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর হাতে বন্দি হয়ে থাকতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জনগণের রাজনৈতিক অংশ গ্রহণ বাড়ানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যে সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনা করা হয় নাগরিক সমাজ তাকে আরো গতিশীল করতে সম্পূরক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

৪. রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করতে হলে তার প্রতি নাগরিক দায় বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। আর নাগরিক সমাজ ঠিক সেই কাজেই সহায়ক হতে পারে। একথা ঠিক নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রের কাছে প্রাপ্য নাগরিকদের দাবি দাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে যেমন সাহায্য করে তেমনি নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে তৎপর হতেও নাগরিকদের সক্ষম করে তুলতেও তার ভূমিকা হতে পারে ইতিবাচক।

৫. নয়া রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে নাগরিক সমাজের নেতৃত্বের দিকেই হাত বাড়াতে হয়।

৬. যে কোন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্ছার হয়ে থাকে নাগরিক সমাজ।

৭.৮ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে সিভিল সোসাইটি

বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কার ঃ একটি প্রাথমিক প্রস্তাব (সুজন কর্তৃক প্রস্তাবিত, ৬ এপ্রিল ২০০৬)

১.১। ভোটার তালিকার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ ঃ-

* ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল হতে হবে।

* ভোটার তালিকা নিয়মিতভাবে সংশোধন বা আপ-ডেট করতে হবে এবং ক্রমাগত প্রচারাভিযান চালাতে হবে যাতে নতুন ভোটার ও ঠিকানা পরিবর্তনকারী ব্যক্তিগণ খুব সহজেই তালিকাভুক্ত হতে পারে।

* বছরব্যাপী ভোটার তালিকা সংশোধন ও বিয়োজনের জন্য পোস্ট অফিসকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

* ভোটারদের ছবি ও ভোটার নম্বর সম্বলিত পরিচয়পত্র দিতে হবে, যাতে ভোটের দিনে নির্বাচনী বুথ স্থাপন করতে না হয়।

১.২। নির্বাচনী ব্যয় সীমা হ্রাস এবং এতে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

* নির্বাচনী সময়সীমা যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে কঠোর নজরদারি করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিক হবার ১৫ দিনের মধ্যে প্রার্থী তার নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারিত ফরমে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে আইনে বর্ণিত শাস্তি (২-৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড) কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। হিসাব দাখিল করা না হলে গেজেট নির্বাচনী ফল প্রকাশ স্থগিত রাখা যেতে পারে।*

* দাখিল করা এ সকল তথ্য নির্বাচন কমিশন ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে প্রচার করবে এবং যথাযথ নিরীক্ষার পর অসত্য তথ্য প্রদানকারীদের নির্বাচন বাতিল করবে।

* সমর্থকদের ব্যয় প্রার্থীর ব্যয় বলে বিবেচিত হবে।

১.৩। নির্বাচনী বিরোধ / মামলা দ্রুততার সাথে নিস্পত্তিকরণ

* নির্বাচন পূর্ব বিরোধ রিটার্নিং অফিসার / এসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিস্পত্তি করবেন, যার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপীল করা যাবে। কমিশন ১৫ দিনের মধ্যে আপীল নিস্পত্তি করবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

* সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে কমিশন কোন কেন্দ্রের বা কেন্দ্রসমূহের নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করতে পারবে।

* সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ গঠন করবে যাতে নির্বাচনোত্তর বিরোধ/মামলা নির্ধারিত ছয় মাসের মধ্যেই চূড়ান্তভাবে নিস্পত্তি হয়।

১.৪। ভোটারদের তথ্য ভিত্তিক ক্ষমতায়ণ ঃ

* প্রত্যেক প্রার্থী মনোনয়ন পত্রের সাথে একটি এফিডেভিট দাখিল করবেন যাতে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, তার এবং তার নিকটাত্মীয়দের আয়-ব্যয়ের তালিকা, আয়ের উৎস, সম্পদের তালিকা এবং তিন বছরের আয়কর রিটার্ন সংযুক্ত থাকবে। এফিডেভিট দাখিল না করলে মনোনয়ন পত্র বাতিল হবে।

*এফিডেভিটে প্রার্থীর অতীত অপরাধের তালিকা এবং চার্জ গঠন করা হয়েছে এমন বিচারাধীন মামলার তালিকা সংযুক্ত করতে হবে। যে কেউ বিরোধী এফিডেভিট (Counter Affi-davit) দাখিল করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

* নির্বাচন প্রতিনিধিদের প্রতি বছর তাদের এবং তাদের ঘনিষ্ট জনদের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য ও আয়কর রিটার্ন নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে।

* এফিডেভিট প্রদত্ত তথ্য এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয় ও সম্পদের হিসাব সম্পর্কিত তথ্য নির্বাচন কমিশন ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা করবে। প্রদত্ত তথ্য অসত্য প্রমাণিত হলে কমিশন তার প্রার্থীতা/নির্বাচন বাতিল করবে।

* আদালত/তদন্ত কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত দুর্নীতিগ্রস্ত ও শাস্তিগত ব্যক্তিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে হবে।*

* ঋণখেলাপী ও সরকারি সেবার বিলখেলাপীদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।

২.০। গণতান্ত্রিক নিয়মনীতিঃ

২.১। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান

* নির্বাচন আচরণ বিধি সংশোধন করতে হবে যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখের ৬ মাস পূর্ব থেকে অথবা কোন কারণে সংসদ বিলুপ্ত হলে, বিলুপ্তির তারিখ থেকে কোন দল বা প্রার্থী কোন নির্বাচনী এলাকায় কোন আর্থিক বা প্রকল্প গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিতে না পারে এবং দল তাদের অর্জনেরও প্রচারনা চালাতে না পারে।

* নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের এবং নির্বাচনের দিনে পেশী শক্তি ব্যবহারের শাস্তি কঠোর ও তাৎক্ষনিক হতে হবে।

* নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্ট্যাগার্ড ভোটিং (Staggered Voting) এর ব্যবস্থা করতে হবে।

* নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে সকল প্রকার দেয়াল লিখন ও যত্রতত্র পোস্টার, লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদি লাগানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

* ব্যালটে "না" বাচক ভোটের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যদি "না" বাচক ভোট প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের বেশী হয় তাহলে পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* কোন কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোট গড় জাতীয় ভোটের ২০ শতাংশের বেশী হলে অথবা কোন প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের ১০ শতাংশের বেশী পেলে ঐ কেন্দ্রের ভোট আপনা আপনি বাতিল হওয়ার বিধান করতে হবে।

* বিজয়ী এবং পরাজিত প্রার্থীর ভোটের মার্জিন এক শতাংশের কম হলে পুনর্গণনার বিধান করতে হবে।

* ভূয়া প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কেউ ভূয়া প্রার্থী প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে।

* ভোট গ্রহণ সঠিক করার জন্য নির্ভরযোগ্য যান্ত্রিক পদ্ধতি ভবিষ্যতে চালু করতে হবে।

* কোন ব্যক্তি একাধিক আসনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

২.২। রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন

* রাজনৈতিক দল সমূহের নিবন্ধন ও প্রতি দুই বছর পর নিবন্ধন নবায়ন আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং শুধু নিবন্ধিত দলই নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারবে।

* নিবন্ধনের শর্ত হবে দলীয় গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত পদসমূহ নিয়মিতভাবে যথাযথ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা।

* দলের তহবিল গঠন ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ এবং সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। প্রতি বছর দলের আয় ব্যয়ের অডিট করা হিসাব কমিশনে দাখিল করতে হবে। নির্বাচন পরবর্তী হিসাবও নির্দিষ্ট ছকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে দাখিল করতে হবে।

* দলীয় মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে দলের প্রাথমিক সদস্যদের মতামত নেয়ার পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

* দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে অন্তত পাঁচ বছরের দলীয় প্রাথমিক সদস্যপদ ও দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

* অর্থের বিনিময়ে দলীয় মনোনয়ন প্রদান প্রমাণিত হলে দলের নিবন্ধন বাতিল হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* কোন দল ক্রমাগতভাবে ৯০ কার্যদিবস সংসদ অধিবেশন বর্জন করলে দলের নিবন্ধন বাতিল হবে।

৩.০। গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ঃ

৩.১। রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

* সংসদ সদস্য ও নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।

* তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আগামী তিন টার্মের জন্য সীমিত করতে হবে।

* তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল কাজ হবে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা।

৩.২। নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালীকরণ

* প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে সত্যতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তারা নিয়োগ পাবেন এবং সংসদ ভেঙ্গে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

* নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন নিজস্ব সচিবালয় থাকবে।

* নির্বাচনী আইনসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে।

* নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব বাজেট থাকবে ও নির্বাচন কমিশনের ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের (Consolidated fund) নির্ধারিত ব্যয় হিসেবে গন্য হবে।

* নির্বাচন পদ্ধতির এবং নির্বাচন সামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়কে চাওয়া মাত্র কমিশনকে সহায়তা করতে হবে।

* নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বার্থ জড়িত আছে এমন সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য সভায় গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩। জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্বশীলতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ

Dhaka University Institutional Repository

* সকল পেশা ও সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তিদের, প্রতিনিধিদের নিয়ে সংসদের উচ্চ কক্ষের বিধান করতে হবে।

* নারীদের জন্য অন্তত এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

* সংসদ সদস্যদের আইন প্রনয়ণের (৬৫ অনুচ্ছেদ) সাংবিধানিক দায়িত্বে নিবিষ্ট এবং স্থানীয় উন্নয়ন কাজে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে।

* নির্বাহী বিভাগের যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে। বিরোধী দল থেকে সংসদীয় কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান হবেন।

* কার্য প্রণালীতে পরিবর্তনের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

* সংবিধানের (৭০) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন সদস্য তার সদস্যপদ তখনই হারাবেন যদি তার প্রদত্ত ভোটের কারণে সরকারের পতন ঘটে।

৩.৪। শাসন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ

* সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের আলোকে ও সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে। এ সকল নির্বাচন একই সময়ে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালীন অনুষ্ঠিত হবে।

* ক্ষমতা ও দায়দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

* প্রশাসনে কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমলাতন্ত্রের আমূল সংস্কার এবং এইটিকে গণমুখী ও দল নিরপেক্ষ করতে হবে।

* নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

* জাতীয় বাজেটের অন্তত এক তৃতীয়াংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি স্বাধীন অর্থ কমিশনের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিধান করতে হবে।

* ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রাম সরকার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

উপর্যুক্ত সুপারিশগুলো একটি প্রাথমিক প্রস্তাবনা মাত্র, শেষ কথা নয়। এর মূল লক্ষ্য হলো সংস্কার বিষয়ে তুমুল বির্তকের সূচনা করা, যা থেকে একটি জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টি হবে। আমরা আশা করি যে, আমাদের সচেতন চিন্তাশীল নাগরিকগণ সোচ্চার হবেন এবং আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচন তথ্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে কলুষমুক্ত করতে একটি ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করতে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করবেন।

সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিতে সিপিডির ১২ দফা সুপারিশ ঃ

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) নির্বাচনে কালো টাকার দৌরাত্য কমাতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আইনি বাধ্যবাধকতায় আনার দাবি জানিয়েছে।

সিপিডি ইলেকশন প্লাস ইকনোমিক এজেন্ডা নামে একটি কর্মসূচী উপস্থাপন করেছে। এই কর্মসূচীতে ১২ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। [১৮]

এই কর্মসূচীর ১২ দফার মধ্যে রয়েছে অর্থ পাচার রোধ আইন প্রয়োগ, কালো টাকা সাদাকারীদের নাম প্রকাশের আইন, ঋণখেলাপীর সংজ্ঞা পূনঃনির্ধারন, ঋণখেলাপীদের নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য হালনাগাদ করা, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের মাধ্যমে প্রার্থীদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ, তথ্য জানার অধিকার আইন কার্যকর করা, সরকারি ক্রয়নীতির স্বচ্ছ বাস্তবায়ন, রাজনীতিতে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ আইন প্রনয়ণ, সরকারি ব্যাংকগুলোর পুনর্গঠন অব্যাহত রাখা, জ্বালানি খাতের জন্য স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের বড় প্রস্তাবগুলো নিরীক্ষার জন্য কমিটি গঠন। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংস্থাটির তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

Dhaka University Institutional Repository

এ সুপারিশ এর অর্থই হল এমন একটি শক্তিশালী অর্থনীতি তৈরী করা। যা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারকে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্বাচনে যাতে কালো বা অপ্রদর্শিত অর্থ এমনকি বিদেশ থেকে গোপনে অর্থ এনে ব্যবহার না হতে পারে। এ জন্য এন্ট্রি মানি লন্ডারিং আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে। টাকা সাদাকারী কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হলে তাঁদের নাম প্রকাশ করা উচিত। নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হতে চাইলে তাঁদের সম্পর্কে জানার অধিকার জনগণের আছে। ঋণ খেলাপীরা যাতে প্রার্থী হতে না পারে সে জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। ঋণখেলাপীর সংজ্ঞারও পরিবর্তনকরা প্রয়োজন। একবার পুনঃ তফসিল করার পর পাঁচ বছর খেলাপী হয়ে থাকা বন্ধ করতে হবে। মিথ্যা তথ্য দিয়ে নির্বাচিত হলে তার প্রার্থিতা বাতিল করার বিধান থাকতে হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরীতে সরকারকে প্রথাগত নির্বাচনী পদক্ষেপের বাহিরে যেতে হবে। এর জন্য বেশ কিছু কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করতে হবে। তিনটি প্রধান দিকের প্রতি নজর দিতে হবে। যেমন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরী করা, দুর্নীতি দমন কার্যক্রম শক্তিশালী করা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার।

নির্বাচনী আইনের সংস্কার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের খসড়া সুপারিশমালাঃ

নির্বাচন কমিশন যে সংস্কার প্রস্তাবগুলোর খসড়া প্রস্তুত করেছে, তা পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে পৃথক পৃথক শিরোনামে বর্ণনা করা হলো।(প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০০৭)

ক. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর সংশোধনীসমূহ

নিচে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ সংশ্লিষ্ট সংশোধনীগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

১. কেবল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের মাধ্যমে বা স্বতন্ত্র ভিত্তিতে প্রার্থিতার সুযোগ

ঃ বর্তমানে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়টি ঐচ্ছিক। বর্তমানে যেকোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা সমীচীন বলে মনে করে। সেক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীগণ সংসদ নির্বাচনে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের যোগ্যতা পৃথকভাবে নিরূপণ করতে হবে। সংসদ নির্বাচনে অনেক সময় ডামি প্রার্থীরূপে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং এরূপ ডামি প্রার্থীর মাধ্যমে নির্বাচনের পরিবেশ এ প্রবণতা রোধ করা দরকার।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

ক. নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন ছাড়া কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

খ. তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না এবং কোনো নির্বাচনী এলাকায় কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিলে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে ঐ নির্বাচনী এলাকার ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থনসূচক ও স্বাক্ষরসংবলিত তালিকা জমা দিতে হবে। অন্যথায় তিনি প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

গ. ভবিষ্যতে নিবন্ধনের শর্ত বলবৎ হওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থীদের তিন বছরের অধিককাল কোনো দলের সদস্য না থাকলে নির্বাচনে ঐ দলের পক্ষ থেকে অংশ গ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হবে না এ রূপ শর্তও সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তবে নিবন্ধনের মেয়াদ তিন বছরের অধিক না হলে তা প্রযোজ্য হবে না।

২. অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণসংক্রান্ত ঃ-

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সম্পর্কে বিধানবলি রয়েছে। সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে সরকারি/বিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরপরই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। এতে স্বার্থের সংঘাতমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যমান আইনে এ ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ না থাকায় এর প্রতিবিধানের জন্য আইন সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর অথবা এরূপ প্রতিষ্ঠানের কোনো পদে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত থাকলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী দিন থেকে কমপক্ষে তিন বছর অতিবাহিত না হলে কেউ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৩. এনজিওর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ঃ

বিদেশি অনুদান বা তহবিল গ্রহণকারী এনজিওর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো স্বার্থের সংঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। বর্তমানে এদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধানিষেধ নেই। তাই কমিশন এরূপ এনজিওসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমিত বাধা নিষেধ আরোপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ

বিদেশী অনুদান বা তহবিল গ্রহণকারী এনজিওর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণের বা তার চাকরি শেষ হওয়ার পর পরবর্তী দিক থেকে কম পক্ষে তিন বছর অতিবাহিত না হলে কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৪. ঋণখেলাপিদের সংসদ নির্বাচনে অযোগ্যকরণ সংক্রান্ত বিধান সুস্পষ্টকরণ ঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ঋণ খেলাপীগণ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না। কিন্তু বিদ্যমান আইনের দুর্বলতা সুযোগ নিয়ে ঋণখেলাপিগণ বিগত নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে আরপিওর অনুচ্ছেদ ১২ এর (১) (এ) প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে কোনো ঋণ বা ঋণের কিস্তি প্রদানে খেলাপি কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবির তথ্যের উপর নির্ভর করা হয়। এ তথ্য সব সময় হালনাগাদ থাকে না, তা ছাড়া এ তথ্য সেকেন্ডারী। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকসমূহ থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ব্যাংকের বুক অব অ্যাকাউন্টসে যিনি এক বছর আগে খেলাপী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই খেলাপী। তা ছাড়া ইতিপূর্বে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেই ঋণখেলাপী বলে গণ্য করা হতো, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ এ আদেশের আওতাভূক্ত ছিল না। এ কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও এ আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

ক. মনোনয়নপত্র দাখিল করার এক বছর আগেকার তারিখ থেকে প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখায় রক্ষিত বুকস অব একাউন্টস অনুযায়ী ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধিত থাকতে হবে। অন্যথায় তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

খ. ঋণ খেলাপী বলতে ঋণ গ্রহীতার পাশাপাশি ওই ঋণের জামিনদার ও বন্ধকদাতাকেও বোঝাবে।

গ. সংশোধিত আইনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বহণকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৫. সেবামূলক সংস্থার বিলখেলাপী ঃ-

বিদ্যমান আইনে এরূপ সংস্থার বিল বকেয়া থাকলে তা প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণে কোনরূপ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয় না। বাস্তবে দেখা যায়, অনেক প্রার্থী বা বিগত সংসদ সদস্যদের কাছে এরূপ সংস্থাসমূহের বিপুল পরিমাণ বিল অপরিশোধিত থাকে, যা আদায় করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। বস্তুত দেশের আইন প্রণেতাদের আচরণ অন্যদের কাছে দৃষ্টান্তমূলক হওয়া সমীচীন বিধায় প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিধান সংযোজন করা আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ

সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের তিন মাস আগেকার পর্যন্ত পরিশোধযোগ্য বিল অপরিশোধিত থাকলে অনুরূপ বিলখেলাপী নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

৬. একাধিক আসনে প্রার্থীতাসংক্রান্ত ঃ-

বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনে কোনো ব্যক্তি দুই বা ততোধিক আসনে প্রার্থী হতে পারবেন। আরপিওতে সর্বোচ্চ পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ রাখা হয়েছে। অতীতে দেখা গেছে অনেক প্রার্থী একের অধিক, এমনকি সর্বোচ্চ পাঁচটি আসনে প্রার্থী হয়েছেন। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক আসনে নির্বাচিত হলে পরবর্তী সময় সংবিধানের ৭১(২)(ক) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী তাকে একটিমাত্র আসন রেখে বাকি সব আসন ছেড়ে দিতে হয়। তিনি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসনগুলোতে পুননির্বাচন করতে হয়। এসব পুননির্বাচনে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সর্বোচ্চ

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি আসনে প্রার্থিতার সুযোগ রেখে আইন সংশোধনের প্রস্তাব করতে যাচ্ছে। তা ছাড়া কমিশন পুনর্নির্বাচনের সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি অংশ এরূপ প্রার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা সমীচীন বলে মনে করেন।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ

ক. কোনো ব্যক্তি একই সময় তিনটির অধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

খ. একাধিক আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করলে অতিরিক্ত প্রতিটি আসনের জন্য পাঁচ লাখ টাকা জমা দিতে হবে এবং জয়লাভ করে এরূপ আসন ছেড়ে দিলে এ জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৭. মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনের আপিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ-

বর্তমানে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গৃহীত হওয়ার পর কেউ সংক্ষুব্ধ হলেও আপিল করতে পারেন না, তবে প্রার্থিতা বাতিলের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল দায়ের করা যায়। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য প্রার্থিতা গ্রহণ/বাতিল উভয় ক্ষেত্রে আপিল বিবেচনার এখতিয়ার কমিশনের থাকা বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া শুধু প্রার্থী নন, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও এরূপ আপিলের সুযোগ দেওয়া সমীচীন। বর্তমানে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে তার যুক্তি লিপিবদ্ধ করেন। গ্রহণ বা বাতিল উভয় ক্ষেত্রে এরূপ যুক্তি পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা সমীচীন।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

ক. রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র গৃহীত বা বাতিল হলে তার আদেশের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন বরাবর আপিল করা যাবে। রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো প্রার্থী বা ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সেবা প্রদানকারী সংস্থা যদি সংক্ষুব্ধ হন, তবে তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে আপিল করতে পারবেন।

খ. মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের সপক্ষে রিটার্নিং অফিসার তার যুক্তি /মতামত আদেশ লিপিবদ্ধ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ. আপিল করা হলে অনুরূপ আপিলের ফলাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বা আপিলের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসার কোনো প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করতে পারবেন না।

৮. প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের গণনার ফলাফল প্রকাশ ও পোলিং এজেন্টদের সংখ্যা সীমিতকরণ ঃ

বর্তমানে প্রার্থীগণ একেকটি ভোটকেন্দ্রে একটি বুথে সর্বোচ্চ দুজন এবং একাধিক বুথ থাকলে সর্বোচ্চ পাঁচজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন। এ সংখ্যা কমিয়ে চারে নামানোর যৌক্তিকতা অনুভূত হচ্ছে। তা ছাড়া ভোট কেন্দ্রের ফলাফল তাৎক্ষনিকভাবে ঘোষণা করা না হলে অনেক সময় আপত্তি উত্থাপন করা হয়। বিষয়টিতে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ভোটকেন্দ্রের ফলাফল সেখানেই প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হচ্ছে। পাশাপাশি ভোট গণনাকালে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের ভোট গণনার কাজ পর্যবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করা সমীচীন বিবেচিত হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

ক. একটি বুথে সর্বোচ্চ দুজন এবং সার্বিকভাবে কোনো ভোটকেন্দ্রে সর্বোচ্চ চারজনের বেশী পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করা যাবে না।

খ. প্রিসাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের ভোট গণনার কাজ পর্যবেক্ষণ সুবিদা প্রদান করবেন এবং কেন্দ্রের ফলাফল এজেন্টদের হস্তান্তরের পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রের দেয়ালে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯. জামানত বাজেয়াপ্ত ঃ-

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর জামানত হিসেবে প্রার্থীর জমাকৃত অর্থ জমাকারী ব্যক্তি বা তার আইনগত প্রতিনিধির নিকট ফেরত দেওয়া হয়। বর্তমান আইনে কোনো প্রার্থী নির্বাচনী এলাকার সর্বমোট ভোটের এক-অষ্টমাংশের কম ভোট পেলে তার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ সীমা কিছুটা বৃদ্ধি করা সঙ্গত বলে কমিশন মনে করে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

কোনো প্রার্থী নির্বাচনী এলাকার প্রদত্ত সর্বমোট ভোটের এক-পঞ্চামাংশের কম ভোট পেলে জামানত (টাকা ১০,০০০/-) বাজেয়াপ্ত হবে।

১০. প্রার্থীর নির্বাচনী আয়ের উৎস ঃ-

বর্তমান আইনে কোনো প্রার্থীকে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের দিন থেকে সাত দিনের মধ্যে সম্ভাব্য আয়ের উৎস সম্পর্কে বিবৃতি জমা দিতে হয়। অতীতে দেখা গেছে কোনো কোনো প্রার্থী তা জমা দিতে গড়িমসি করেছেন। তাই এটি মনোনয়নপত্রের সঙ্গেই জমা নেওয়ার বিধান করা সমীচীন। সেই সঙ্গে তিনি যদি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি কারও কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করবেন বলে প্রত্যয় করেন। তাহলে এরূপ ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের আয়ের উৎসের বিবরণ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বলে কমিশন মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

প্রত্যেক প্রার্থীকে তার নির্বাচনী খরচ নির্বাহ করার জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎস সম্পর্কিত একটি বিবরণী মনোনয়নপত্রের সঙ্গে নির্ধারিত ফরমে জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে স্বীয় আয়ের বাইরে যেসব উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হবে, সেসব আয়ের উৎসসংক্রান্ত তথ্যও দিতে হবে।

১১. বিদেশি সূত্র বা রাষ্ট্র থেকে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ঃ

রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনে যে অর্থ ব্যয় করে, সে অর্থ আয়ের উৎস সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে। আরও কোনো উৎস থেকে চাঁদা পাওয়া গেলে তা প্রার্থীদের জানানোর নির্দেশনা দেওয়া দরকার এবং বাংলাদেশি বা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নন এমন কারও কাছ থেকে চাঁদা/ অনুদান গ্রহণ আইনসঙ্গত বিবেচনা করা সমীচীন হবে না।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ

কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নন এমন কারও কাছ থেকে বা কোনো বিদেশি সংস্থা বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো অনুদান বা ফান্ড গ্রহণ করতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

১২. রাজনৈতিক দলের নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়ের বিবরণী ঃ-

বর্তমান আইন অনুযায়ী সব রাজনৈতিক দলকে সকল আসনের বিপরীতে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে রাজনৈতিক দলের ব্যয়ের বিবরণী পৃথক পৃথকভাবে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পেশ করতে হয়, তবে সার্বিকভাবে নির্বাচন কমিশনে এরূপ ব্যয়ের বিবরণ পাঠাতে হয় না। এরূপ বিবরণ কমিশনে দাখিল করার নিয়ম প্রচলন করা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

রাজনৈতিক দলে মহাসচিবের স্বাক্ষরে নির্ধারিত ফরমে ঐ রাজনৈতিক দলের সব নির্বাচনী আসনের সার্বিক ব্যয়ের বিবরণী নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

১৩. নির্বাচনী দলিল-দস্তাবেজ পরিদর্শন ঃ-

কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দলিলাদি প্রার্থীদের কাছ থেকে হলফনামার মাধ্যমে গ্রহণ এবং এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করার পাশাপাশি তথ্য গোপন বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করার জন্য দন্ড আরোপ করা সমীচীন মনে করে। নতুনভাবে প্রস্তাবিত এ বিধানে অনুরূপ তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইডে প্রার্থীর দাখিলাকৃত বিবরণী রিটার্ন এবং দলিল-দস্তাবেজ প্রকাশ করা হবে। যদি কেউ মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে ভুল তথ্য প্রদান করেন বা আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীতে ভুল তথ্য প্রদান করেন এবং তা শনাক্ত করা যায়, তবে সংশ্লিষ্ট সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করার প্রস্তাব করা হবে।

১৪. নির্বাচনী মামলা ঃ-

নির্বাচনী মামলা নিস্পত্তিতে বর্তমানে বহু সময় লেগে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, এ বিলম্বের কারণে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী বিচার প্রক্রিয়ার এমন সময়ে প্রতিকার পান, যখন তার তাৎপর্যই হারিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এ সমস্যার প্রতিবিধানকল্পে নির্বাচনী মামলা নিস্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ করে নতুন বিধান সংযোজন করার প্রস্তাব করা হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

ক. নির্বাচনী মামলা দাখিলের তারিখ থেকে হাই কোর্ট বিভাগ কর্তৃক ছয় মাসের মধ্যে সকল নির্বাচনী মামলার নিস্পত্তি করতে হবে এবং হাইকোর্টের বেঞ্চ পুনর্গঠন করা হলেও এ সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাবে না। হাইকোর্ট এ জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ গঠন করতে পারবেন।

খ. হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল দায়ের হলে আপিল বিভাগ তা দাখিলের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে এবং লিভ টু আপিল মঞ্জুর হওয়ার তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করবেন।

গ. অন্য আইনে যেরূপ বিধানই থাকুক না কেন, মামলা প্রক্রিয়ায় সাংসদ সদস্যদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে এ আইনের বিধানাবলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

১৫. রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য শর্তাবলী ঃ

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করায় একাধিক সংশোধনী আনয়ন করতে হবে। এসব সংশোধনীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বচ্ছতা আনয়নসহ জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

ক. নিবন্ধনের শর্তাবলি ঃ বিদ্যমান রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যেকোন সংসদ ঐ রাজনৈতিক দলের সদস্য অন্ততপক্ষে একটি আসন লাভ করার প্রমাণ বা তা না হলে সর্বশেষ নির্বাচনে ঐ দল কর্তৃক বা সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের ২ শতাংশ ভোট প্রাপ্তি অথবা,

নতুন দল ঃ এ শর্ত পূরণ করে না এমন রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে ঃ-

১. রাজনৈতিক দলের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অফিস থাকতে হবে, বিশেষভাবে বাংলাদেশের অর্ধেক জেলায় এবং জেলাগুলোর আওতাধীন উপজেলায় কার্যকরী কমিটি ও অফিস থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. জেলাগুলোতে কমপক্ষে এক হাজার এবং উপজেলাগুলোতে ২০০ জন করে সদস্য থাকতে হবে এবং সদস্যদের নিবন্ধিত হতে হবে।

খ. নিবন্ধনের জন্য রাজনৈতিক দলকে আবেদনপত্রের সঙ্গে অন্যান্য তথ্যসহ নিম্নোক্ত তথ্যগুলোও প্রদান করতে হবে ঃ-

১. ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য ঃ

রাজনৈতিক দলের নামে পরিচালিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টসংক্রান্ত তথ্য (নাম ও নম্বরসহ) দেশের বাইরে অবস্থিত ব্যাংকের নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বরও (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে।

২. আয়ের উৎস ঃ দলের তহবিলের আয়ের বিশদ উৎস জানাতে হবে।

গ. গঠনতন্ত্র ও নির্বাচনী ইশতেহার ঃ

দরখাস্তের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রের অনুলিপি প্রদান করতে হবে। সেই সঙ্গে নির্বাচনী ইশতেহারের অনুলিপি দিতে হবে। গঠনতন্ত্রে এই মর্মে বিশেষ বিধান থাকতে হবে, দল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করে এবং তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য এবং অখন্ডতা সমুন্নত রাখবে।

ঘ. দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা ঃ-

প্রত্যেক নিবন্ধনকৃত রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে তাদের জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের কমিটির/ সংগঠনের (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান থাকতে হবে এবং ঐ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে জাতীয়/স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে।

ঙ. কেন্দ্রীয়/ নির্বাহী কমিটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা ঃ

প্রতিটি নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলকে তাদের গঠনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সম্মেলন (যে নামে অভিহিত হোক না কেন) নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করতে হবে।

চ. অডিট ঃ-

প্রত্যেক নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলকে প্রতি বছর তাদের হিসাবস্বীকৃত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করাতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে পেশ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ছ. অনিবন্ধনকৃত দলের সঙ্গে জোট গঠনে বাধা ঃ-

নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত প্রার্থী কোনো অনিবন্ধীতকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করতে পারবে না।

জ. কোনো রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত প্রার্থী কোনো অনিবন্ধিত দলে যোগদান করলে তা ঐ অনিবন্ধিত দলের নিবন্ধনের যোগ্যতা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঝ. নিবন্ধন বাতিল ঃ- নিবন্ধীকৃত কোনো রাজনৈতিক দল যদি অবলুপ্ত হয় বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একত্রীভূত হয় এবং যদি আদেশের সংশ্লিষ্ট অংশের বিধানাবলী ভঙ্গ করে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল হবে।

১৬. রাজনৈতিক দলকে প্রদত্ত দান বা উপঢৌকন কর মওকুফ সুবিধা প্রদান ঃ-

রাজনৈতিক দলের পরিচালনার জন্য যে তহবিল প্রয়োজন তাতে সদস্যদের দান-অনুদানের বিষয়টি আকর্ষণীয় করার জন্য প্রণোদনা দেওয়া সমীচীন।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

রাজনৈতিক দলের তহবিল সংগ্রহ সহজ করার জন্য রাজনৈতিক দলকে প্রদত্ত দান-অনুদান কর মওকুফ সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করা হবে।

১৭. নির্বাচনী অপরাধের জন্য কমিশনকে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান ঃ

২০০১ সালে আরপিও সংশোধন করে গুরুত্বর নির্বাচনী অপরাধের জন্য কমিশনকে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। তবে অল্প কিছুদিন পরে এ বিধান বিলুপ্ত করা হয়। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, প্রার্থীগণ কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান উপেক্ষা করে গুরুত্বর নির্বাচনী অপরাধ সংঘটিত করেছেন। এ সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য কমিশনের প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে ওই বিধান পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব করা হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ

নির্বাচনী অপরাধের জন্য কমিশনকে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান করার প্রস্তাব করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. লাভজনক পদের সংজ্ঞায় সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনারদের অন্তর্ভূক্ত করা ঃ-

১৯৯৬ সালে সিটি কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরসসহ ওয়ার্ড কমিশনারগণ ঐ পদে থাকাকালে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত গণ্য হবে না মর্মে এক সংশোধনী আনা হয়েছিল। এর তাৎপর্য এই যে, অনুরূপ পদে থাকাকালীন তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্য থাকবেন। ওই সংশোধনীর বর্তমানে কোনো তাৎপর্য নেই।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ ওই বিধান বাতিল করার প্রস্তাব করা হবে।

১৯. নির্বাচনী অপরাধের শাস্তিসংক্রান্ত বিধানবলি ঃ-

নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম নিয়ন্ত্রন এবং নির্বাচনী আইনের বিধিবিধান প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য দন্ডের বিধানগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন। তা ছাড়া গুরুত্ব বিবেচিত অপরাধের জন্য কমিশন কঠোর দন্ড আরোপের যৌক্তিকতা অনুভব করে বিধায় প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা কমিশনকে প্রদানের সুপারিশ করবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ

নির্বাচনী আইনের জন্য শাস্তির পরিমাণ সংশোধন করা হবে এবং তা হবে ন্যূনতম টাকা ২০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ টাকা ১,০০,০০০/- তা ছাড়া কমিশন অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রার্থিতা নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা কমিশনকে প্রদানের সুপারিশ করবে।

২০. অন্যান্য সংশোধন ঃ-

বর্তমান আইনে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণ লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত নন বলে গন্য করা হয়। তাতে স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। আইন সংশোধন করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। অর্থ্যাৎ এ দুটি পদ লাভজনক গন্য করা হবে না।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ-

আইনে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বিষয় উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২

৩. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর প্রস্তাবিত সংশোধনের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এর সংশ্লিষ্ট অংশে সংশোধনী আনয়ন করা প্রয়োজন হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ ঃ-

নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার যেসব ফরম রয়েছে তা প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করতে হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ ঃ-

ক. হাইকোর্ট বিচারাধীন মামলার রায়ের উপর ভিত্তি করে আটটি তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য সংযোজন করে মনোনয়নপত্র (ফরম-১) সংশোধন করা হবে।

খ. মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে।

গ. নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ এ বিধি ৯ এ বর্তমানে ১৫০টি প্রতীক রয়েছে। তার মধ্যে ক্রমিক নং- ১৮ এ উল্লেখিত বই ও ক্রমিক নং- ২৭ এর উল্লেখিত উট বাদ দেওয়া।

ঘ. বিধিমালার ২০ বিধিতে আপত্তিকারী প্রত্যেক প্রার্থী বা তার পোলিং এজেন্ট প্রত্যেক আপত্তির জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে নগদ পাঁচ টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা। বর্তমানে তা দুই টাকা আছে।

গ. রাজনৈতিক দলের নিবন্ধীকরণ বিধিমালার সংশোধনী ।

৪। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯০ তে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনে উল্লেখ রয়েছে । পরে এই আইনের আওতায় নির্বাচন কমিশন (রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণ) বিধিমালা, ২০০১ প্রণীত হয়। এ বিধিমালার ফরমও সংশোধিত আইনের আলোকে পরিবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ- নিবন্ধন বিধিমালায় কিছু ফরম প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সুষ্ঠু নির্বাচন ও মৌলিক পদক্ষেপ চাই ঃ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের করণীয় নিয়ে প্রথম আলোর গোল টেবিল বৈঠক [১৯]

সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ঃ করণীয় সম্পর্কে এম হাফিজ উদ্দিন খান বলেন এ সরকার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করতে পারে। একটি ভোটার তালিকা তৈরি করতে পারে এবং সাংবিধানিক পদে যোগ্য লোক নিয়োগ দিতে পারে। এসব কাজ করতে এ সরকারের কোনো অসুবিধা হওয়ার কোনো কথা নয় বলে তিনি মনে করেন।

বর্তমান সরকার কিছুটা মন্থরগতিতে চলছে বলে জনাব খান মন্তব্য করেন। তিনি কাজের গতি বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

মেজর জেনারেল (অবঃ) মইনুল হোসেন চৌধুরী বলেন, সব প্রস্তুতি শেষ করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে না। নির্বাচনে কিছু ভুলত্রুটি থাকবেই। সেটা নিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হবে।

অনেকটা একই সুরে ড. আকবর আলি খান বলেন একেবারে শুদ্ধ নির্বাচন পৃথিবীর কোনো দেশে সম্ভব নয়, এমনকি খোদ মার্কিন মুলুকেও না। কতটা ছাড় দিয়ে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা যায় সেটাই বিবেচনায় নিতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী কী সংস্কার করা যায় তার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে পারে বলে তিনি সুপারিশ করেন।

সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাই আসল বলে তিনি মন্তব্য করেন। নির্বাচন কমিশনে যোগ্য মানুষ বসাতে হবে। ভোটার তালিকা, পরিচয়পত্র, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এসবের ব্যবস্থা করবে নির্বাচন কমিশন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেসব কাজে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করবে।

আকবর আলি খান রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করেন তিনি প্রস্তাব দেন, কোনো রাজনৈতিক দল সুনির্দিষ্ট প্রতীক চাইলে তাকে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন করতে হবে। আর কেউ যদি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হতে চান তবে তাকে কমপক্ষে তিন বছর ওই দলের সদস্য থাকতে হবে। তিনি যুক্তি দেখান, সে ক্ষেত্রে কালো টাকার মালিক হঠাৎ করে প্রার্থী হতে পারবেন। আবার সুবিধাবাদীদের দল বদলও বন্ধ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী সংস্কারে নারী প্রসঙ্গঃ[২০]

নারী আন্দোলনের নেত্রীরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানাচ্ছিলেন সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের; কিন্তু দাবি পূরণ হয়নি। এবার নির্বাচনী আইন সংস্কারে নির্বাচন কমিশনের খসড়া প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলের শতকরা ৩৩ ভাগ পদে নারী সদস্যদের রাখার কথা বলা হয়েছে। সংস্কারের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এ প্রসঙ্গগুলো অত্যন্ত জরুরী। এ নিয়ে কয়েকজন বিশিষ্টজনের মতামত উল্লেখ করা হলো।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সুজন সভাপতি মোজাফ্ফর আহমদ বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সংস্কার প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিনির্ধারনে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি নেওয়ার যে খসড়া প্রস্তাব করা হয়েছে তা ভালো প্রস্তাব। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, স্বেচ্ছাচারিতা ও পুরুষতন্ত্র থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নারীদের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব থাকতে হবে। মেয়েদের পিছিয়ে দিতে নির্বাচনের সময় ঝুকিপূর্ণ এলাকায় তাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়। যার ফলে তারা সফলতার মুখ দেখতে পান না। এটা রাজনীতিবিদদের পরিকল্পিত পদক্ষেপ। দলের মধ্যে এ রকম অভ্যন্তরীণ রাজনীতি পরিহার করতে হবে। সব ক্ষেত্রে যেমন ইতিবাচক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও তা হওয়া প্রয়োজন। দলের মধ্যে যে নারী প্রতিনিধি দেওয়া হবে এর সংখ্যা যেন পুরুষদের সংখ্যা থেকে খুব একটা কম না হয় সেদিকে খেয়াল দিতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন, দেশের ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠী নারী। সেখানে নির্বাচন কমিশন প্রস্তাব দিয়েছে এক তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধির কথা। সে ক্ষেত্রে আমি বলব, ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি দেওয়া খুব একটা কঠিন কিছু নয়। এটা দেওয়া যায়। আর এর জন্য আমাদের নারী নেতৃরা অনেক দিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। নির্বাচন কমিশন অনেক সংস্কার করছে যা ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে জনমনে। নারী সংক্রান্ত কি কি সংস্কার তারা করছে, সংস্কারের পদতক্ষেপগুলো কী কী, তা নারী নেতৃদের সঙ্গে আলোচনা করেও করতে পারে। তারা যেন সঠিক অধিকারটি পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মিলিত নারী সমাজের নারী নেত্রী ফরিদা আক্তার বলেন, রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণের জন্য নির্বাচন কমিশন খসড়া বিধিমালায় যে শর্তগুলি দিয়েছে, আশা করছি সেই শর্ত বাস্তবায়িত হবে। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্বের বিষয়টি খুবই একটা ভালো উদ্যোগ। কিন্তু ৩৩ শতাংশ শর্ত বাদ দেওয়া যাবে না। আর নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচনের দিনই নির্বাচন করতে হবে। আমাদের দাবি ছিল, রাজনৈতিক দলগুলোর ২০ ভাগ নারীকে মনোনয়ন দিতে হবে ও এর স্বচ্ছতা থাকতে হবে। মনোনয়ন দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেসব ব্যক্তি দুর্নীতিগ্রস্ত, নারী নির্যাতনকারী তাঁদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে উন্নয়ন সহযোগীদের অবস্থান ঃ

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) রাষ্ট্রদূতেরা বলেছেন, রাজনীতিক দল ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের পর বাংলাদেশে তাঁরা একটি নির্বাচিত সরকার দেখতে চান।[২০] সংস্কার কার্যক্রম শেষ করেই বর্তমান সরকার একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। তৎকালীন ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী বলেন নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারসহ বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী সম্পন্ন করা, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রনয়ণ।[২১]

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক তৎকালীন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচার বলেন, ওয়াশিংটন বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর গনতন্ত্র প্রত্যাশা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারকে আরও সক্রিয় হতে হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।[২২] ঢাকা সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ট্রয়কা প্রতিনিধি দলের নেতা আন্দ্রেয়াস মিসিয়ালিস বলেছেন, সরকার যেসব সংস্কার করেছে তা প্রয়োজনীয়। ট্রয়কা দলের নেতা বলেন, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ব্যবস্থার জন্য গুনগত সংস্কার প্রয়োজন। একটি অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের জন্য সংস্কারগুলো সম্পন্ন করতে হবে।[২৩]

বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার আন্দোলনে দেশের সকল স্তরের মানুষ আজ একমত। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য অনুসরনীয় আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন

Dhaka University Institutional Repository

করলে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মনীতি মেনে চলতে বাধ্য হবে, দলের আয়-ব্যয় সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সকলেই মনে করেন শুধু নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার করে এবং আচরণ বিধি তৈরি যথেষ্ট নয়, এ আচরণ বিধি যাতে কঠোরভাবে মেনে চলা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং দেশের সকলের সহযোগিতা থাকবে। বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিবর্গ মনে করেন। প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার জরুরী সংস্কারের প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক। তা না হলে রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে না। অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটুক। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান বাংলাদেশের নির্বাচন সংক্রান্ত জটিলতাকে একটি মহাসংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার আন্দোলনে সিভিল সোসাইটি ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরা যেমন ছিলেন আপোষহীন, তেমনি স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে এবং সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মানে সর্বদা সকলকে নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। আলোচ্য গবেষণায় তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৯ তথ্যপুঞ্জী

১. প্রথম আলো ৭ এপ্রিল ২০০৭

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রথম আলো, ২৬ এপ্রিল ২০০৭

৬ প্রাগুক্ত

৭. মামুন, মুনতাসির ও রায় জয়ন্ত কুমার; "বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম" ফকরুল চৌধুরী (সম্পাদিত) সিভিল সোসাইটি; তত্ত্ব প্রয়োগ ও বিচার; কথা প্রকাশ, ২০০৮ পৃ- ৮২

৮. Seligman Adam; The Idea of Civil Society. New York, Free Press, 1993

৯. হোসেন সৈয়দ আনোয়ার, "গণতন্ত্র ও সিভিল সমাজ চাওয়া পাওয়ার হিসাব" অরুপরাহী (সম্পাদিত) সিভিল সোসাইটি; রাজনৈতিক পর্যালোচনা; লোকজ পৃ- ৬২, ১৯৯৯)

১০ রহমান, দিলারা ও হক মোঃ আসিরুল; " সিভিল সোসাইটি ও বাংলাদেশ"তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, পৃ, ৩৩৫

১১. মামুন, মুনতাসির ও রায় জয়ন্ত কুমার "বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম" ঢাকা অবসর প্রকাশনী, ১৯৯৫)।

১২. ভোরের কাগজ, ২৯-০৭-১৯৯৭

১৩. Salman L.M. and Anheier, H.K, "Social Origins of Civil Society : Explaining the Non-Profit Sector Cross- Nationality" Volunters, Vol-9, Page- 213-248, 1998)

১৪. রহমান, দিলারা ও হক মোঃ আসিরুল প্রাগুক্ত পৃ- ৩৩৯-৩৪০

Dhaka University Institutional Repository

১৫. রনো, হায়দার আকবর; "সিভিল সোসাইটি ও আজকের বাংলাদেশ " সাপ্তাহিক ২০০০, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪৬, ২৮ মার্চ, ২০০৮, পৃ- ২০

১৬. রহমান, দিলারা ও হক আসিরুল, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৪২

১৭. রহমান, ড. আতাউর; "নাগরিক সমাজ ও সুশাসন" ফকরুল চৌধুরী (সম্পাদিত) "সিভিল সোসাইটি তত্ত্ব প্রয়োগ ও বিচার", কথা প্রকাশ, ঢাকা- ২০০৮, পৃ- ১১২-১২৩

১৮. প্রথম আলো, ২৬ জানুয়ারী ২০০৭

১৯. প্রথম আলো ১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

২০. প্রথম আলো, ৩০ মে, ২০০৭)

২১. প্রাগুক্ত

২২ প্রথম আলো, ১৯মে ২০০৭

২৩ প্রথম আলো, ৭জুন ২০০৭

২৪ ইত্তেফাক ৭ জানুয়ারী ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

কেস স্টাডি

"বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামুলক আলোচনা" শীর্ষক গবেষনার প্রশ্নমালা

নাম ঃ পেশা ঃ

বয়স ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

১। আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা আধুনিক? হ্যাঁ / না। না হলে আপনার মন্তব্য কি?

(ক) নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

(খ) নির্বাচনী আইনগুলি যথাযথ প্রয়োগ হলেই চলবে

(গ) নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজন নেই

২। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে দেশে সংস্কার আন্দোলন হয়েছে কি?

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

৩। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার কি জরুরী? হ্যা/না। হ্যাঁ হলে তা কিভাবে করতে হবে ?

(ক) স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন

(খ) নির্বাচন কমিশনকে আরো কার্যকর করা

(গ) রাজনৈতিক দলের সংস্কার

(ঘ) নির্বাচন কমিশনকে শুধু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেয়া

৪। নির্বাচনী দুর্নীতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চায় কতটা প্রতিবন্ধক বলে আপনি মনে করেন?

(ক) নতুন রাজনৈতিক মূল্যবোধের জন্ম দিচ্ছে

(খ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চাকে পুরোপুরি ব্যাহত করছে

Dhaka University Institutional Repository

(গ) কোন প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে না

৫। নির্বাচনে অবৈধ অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

(ক) নিবেদিত প্রান রাজনীতিবিদগণ কালো টাকার কাছে পরাজিত হচ্ছেন

(খ) নির্বাচনে কোন অবৈধ অর্থ ব্যয় করা হয় না

(গ) নির্বাচনে অবৈধ ব্যয় রোধে রাজনৈতিক দলগুলো আন্তরিক নয়

৬। নির্বাচনী সন্ত্রাসের উৎস সম্পর্কে আপনার ধারনা কি?

(ক) বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য

(খ) রাজনৈতিক দলগুলোর হাতিয়ার হিসেবে

(গ) রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য

৭। রাজনৈতিক দলের সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি? থাকলে কিভাবে?

(ক) পুরনো নেতাদের ঢালাওভাবে দল থেকে প্রত্যাহার করা

(খ) দলের অভ্যন্তরে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা

(গ) পেশীশক্তি বলীয়ান লোকদের রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভূক্তকরণ

৮। প্রার্থী নির্বাচনে কোন বিষয়টি প্রাধান্য পায়?

(ক) প্রার্থীর আঞ্চলিকতা

(খ) প্রার্থীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা

(গ) প্রার্থীর আত্মীয়তার বন্ধন

(ঘ) প্রার্থীর মেধা এবং দেশ প্রেম

৯। নির্বাচনে পেশীশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

(ক) প্রশাসনের সহযোগীতায় পেশীশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয়

(খ) প্রশাসনিক ও আইনের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয়

(গ) পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয় না

১০। আপনি কি দৈনিক পত্রিকা পড়েন? পড়লে কোন ধরনের সংবাদ বেশী পড়েন ?

(ক) রাজনীতি

Dhaka University Institutional Repository

(খ) সংস্কৃতি

(গ) অর্থনীতি

(ঘ) খেলাধূলা

১১। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা কি রকম ?

(ক) দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক

(খ) প্রশাসনের মনোভাবকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়

(গ) নতুন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়

১২। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন ছাড়া অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কি সম্ভব?

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

১৩। নির্বাচনী দুর্নীতির প্রভাব পড়ে-

(ক) রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে

(খ) শুধুমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থার উপর

(গ) সংখ্যালঘুদের উপর

(ঘ) শাসন ব্যবস্থার উপর

১৪। আপনি কি বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করেন ?

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

১৫। প্রশাসনের দলীয়করণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করে কি? করলে কি হবে?

(ক) নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে

(খ) নির্বাচনী দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়

(গ) নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করে

Dhaka University Institutional Repository

১৬। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ কম। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

(ক) ৮০ শতাংশ লোক গ্রামে বসবাস করেন, গ্রামের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর, কাজেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ কম

(খ) শুধুমাত্র ভোটদানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেন

(গ) রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ বেশী

১৭। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে গ্রহণ করছেন?

(ক) অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কিছুটা পরিবর্তন চায়

(খ) গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার চায়

(গ) নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার চায় না

১৮। নির্বাচনী দুর্নীতির ফলে জাতীয় বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে কি? হ্যাঁ / না। হ্যাঁ হলে তা কি ধরনের?

(ক) মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়

(খ) গণতন্ত্রের চৌর্য বৃত্তি ঘটে

(গ) রাজনৈতিক সুষ্ঠু ধারা ব্যাহত হয়

(ঘ) দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়

১৯। আপনি সেটেলাইট চ্যানেল দেখেন কি? দেখলে কি ধরনের অনুষ্ঠান বেশী প্রাধান্য দেন?

(ক) মুভি

(খ) খেলাধুলা

(গ) সংবাদ

(ঘ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

(ঙ) শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

২০। আপনি নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ পড়েন কি?

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

প্রশ্ন ঃ ১. আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা আধুনিক? হ্যাঁ / না। না হলে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবীদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন (খ) নির্বাচনী আইনগুলা যথাযথ প্রয়োগ হলেই চলবে (গ) নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজন নেই	৪০ জন ১০ জন ০ জন	৮০% ২০% ০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালায় বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ৮০% জনমত মনে করে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন এবং ২০% জনমত নির্বাচনী আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগের পক্ষে। সংস্কারের বিপক্ষে কেউ মতামত প্রদান করেনি। অর্থাৎ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ঃ ২. নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারর লক্ষ্যে দেশে সংস্কার আন্দোলন হয়েছে কি ?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক(কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) হ্যাঁ (খ) না	৫০ জন ০ জন	১০০% ০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে দেশে সংস্কার আন্দোলন হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে মতামত জরিপে দেখা যায় ১০০% জনমত মনে করে যে, দেশে সংস্কার আন্দোলন হয়েছে। তাই বলা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রশ্ন ঃ ৩. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার কি জরুরী ? হ্যাঁ / না। হ্যাঁ হলে তা কিভাবে করতে হবে?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা	(ক) স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন (খ) নির্বাচন কমিশনকে আরো কার্যকর করা (গ) রাজনৈতিক দলের সংস্কার	২৭ জন ৫ জন ১৫জন	৫৪% ১০% ৩০%

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য	(ঘ) নির্বাচন কমিশনকে শুধু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেয়া	৩জন	৬%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের প্রশ্ন জরিপে সকলেই সংস্কারকে জরুরী বলেছেন । ৫৪% স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন ৩০% দলীয় সংস্কারের মাধ্যমে এ সংস্কার কার্যক্রম করতে বলেছেন।

প্রশ্ন ঃ ৪. নির্বাচনী দুর্নীতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চায় কতটা প্রতিবন্ধক বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ)	(ক) নতুন রাজনৈতিক	০ জন	০%
ছাত্র / ছাত্রী	মূল্যবোধের জন্ম দিচ্ছে		
রাজনীতিবিদ	(খ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ	৫০ জন	১০০%
চাকুরিজীবী	চর্চাকে পুরোপুরি ব্যাহত করছে		
ব্যবসা	(গ) কোন প্রতিবন্ধক হিসাবে	০ জন	০%
অন্যান্য	কাজ করছে না		
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের প্রশ্ন জরিপে দেখা গেছে ১০০% জনমত বলেছে যে নির্বাচনী দুর্নীতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পুরোপুরি ব্যাহত করছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ঃ ৫. নির্বাচনে অবৈধ অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) নিবেদিত প্রান রাজনীতিবিদগণ কালো টাকার কাছে পরাজিত হচ্ছেন (খ) নির্বাচনে কোন অবৈধ অর্থ ব্যয় করা হয় না (গ) নির্বাচনে অবৈধ ব্যয় রোধে রাজনৈতিক দলগুলো আন্তরিক নয়	৪৫ জন ০ জন ৫ জন	৯০% ০% ১০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালায় দেখা যায় নির্বাচনে অবৈধ অর্থ ব্যবহারের ফলে নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদগণ কালো টাকার কাছে পরাজিত হচ্ছেন। এ ব্যাপারে ৯০% জনমত পক্ষে।

প্রশ্ন ঃ ৬. নির্বাচনী সন্ত্রাসের উৎস সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা	(ক) বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য (খ) রাজনৈতিক দলগুলোর হাতিয়ার হিসেবে (গ) রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে	০ জন ৪৬ জন ৪ জন	০% ৯২% ৮%

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য	সুরক্ষা দেওয়ার জন্য		
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

সন্ত্রাসের উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে ৯২% জনমত প্রকাশ করে যে রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার এর যাত্রা শুরু হয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে দায়ী।

প্রশ্ন ঃ ৭. রাজনৈতিক দলের সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি ? থাকলে কিভাবে ?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ)	(ক) পুরনো নেতাদের ঢালাওভাবে দল থেকে প্রত্যাহার করা।	১ জন	২%
ছাত্র / ছাত্রী		৪৯ জন	৯৮%
রাজনীতিবিদ	(খ) দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা		
চাকুরিজীবী		০ জন	০%
ব্যবসা	(গ) পেশীশক্তিতে বলীয়ান লোকদের রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভূক্তকরণ		
অন্যান্য			
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালায়, মতামত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রায় সকলেই মনে করেন রাজনৈতিক দলের সংস্কার প্রয়োজন এবং তা দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যম।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ঃ ৮. প্রার্থী নির্বাচনে কোন বিষয়টি প্রাধান্য পায়?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) প্রার্থীর আঞ্চলিকতা (খ) প্রার্থীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা (গ) প্রার্থীর আত্মীয়তার বন্ধন (ঘ) প্রার্থীর মেধা এবং দেশ প্রেম	১২ জন ২৮ জন ২ জন ৮ জন	২৪% ৫৬% ৪% ১৬%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

প্রার্থী নির্বাচনে কোন বিষয়টি প্রাধান্য পায়, মতামত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় ৫৬% জনমত বলেছে যে, প্রার্থীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা প্রাধান্য পায় এবং ২৪% আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দেয়।

প্রশ্ন ঃ ৯. নির্বাচনে পেশীশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক(কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) প্রশাসনের সহযোগীতায় পেশীশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয় (খ) প্রশাসনিক ও আইনের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে পেশীশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার	১০ জন ৪০ জন ০ জন	২০% ৮০% ০%

Dhaka University Institutional Repository

	হয় (গ) পেশীশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয় না		
		মোট৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালায়, মতামত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় ৮০% জনমত বলে যে, প্রশাসনিক ও আইনের দূর্বলতার জন্য নির্বাচনে পেশীশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয়। ২০% জনমত প্রশাসনের সহযোগিতাকে দায়ী করেছে।

প্রশ্ন ঃ ১০.আপনি কি দৈনিক পত্রিকা পড়েন? পড়লে কোন ধরনের সংবাদ বেশী পড়েন?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) রাজনীতি (খ) সংস্কৃতি (গ) অর্থনীতি (ঘ) খেলাধুলা	৩২ জন ২ জন ৪ জন ১২ জন	৬৪% ৪% ৮% ২৪%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপর্যুক্ত জনমতে দেখা যাচ্ছে যে ৭২% জনমত সংবাদপত্রে রাজনীতি বিষয়ক সংবাদ পড়ার কথা বলেছেন। ২৪% খেলাধুলা, ৮% অর্থনীতি . ৪% সংস্কৃতি। যা কিনা দেশের রাজনীতি বিষয়ক সংস্কৃতি অনুধাবনের পরিচায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ঃ ১১. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা কি রকম ?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) দেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক (খ) প্রশাসনের মনোভাবকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় (গ) নতুন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়	৩৫ জন ১১ জন ৪ জন	৭০% ২২% ৮%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারে সিভিল সোসাইটির ভূমিকাকে দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক মনে করে মতামত প্রদান করেছে ৭০%। অর্থাৎ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের সিভিল সোসাইটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ঃ ১২. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন ছাড়া অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নর্বাচন কি সম্ভব?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ	(ক) হ্যাঁ (খ) না	০ জন ৫০ জন	০% ১০০%

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য			
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন ছাড়া, অবাধ ও সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন কি সম্ভব কিনা এ ব্যাপারে প্রাপ্ত জনমতে দেখা যাচ্ছে যে সকলেই এক্ষেত্রে একমত যে, নির্বাচন কমিশন যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হয় তবে নির্বাচন স্বচ্ছ হবে না।

প্রশ্ন ঃ ১৩. নির্বাচনী দুর্নীতির প্রভাব পড়ে -

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে (খ) শুধুমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থার উপর (গ) সংখ্যালঘুদের উপর (ঘ) শাসন ব্যবস্থার উপর	৩২ জন ২ জন ০ জন ১৬ জন	৬৪% ৪% ০% ৩২
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত জনমতে দেখা যাচ্ছে যে, ৬৪% জনমত মনে করে নির্বাচনী দুর্নীতির প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে এবং ৩২% মনে করে শাসন ব্যবস্থার উপর । তাই বলা যায় নির্বাচনী দুর্নীতি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ঃ ১৪. আপনি কি বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করেন?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) হ্যাঁ (খ) না	৪২ জন ৮ জন	৮৪% ১৬%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে ৮৪% জনমত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করেন। অর্থাৎ আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা আছে।

প্রশ্ন ঃ ১৫. প্রশাসনের দলীয়করণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করে কি? করলে কি হবে?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে (খ) নির্বাচনী দুর্নীতি বৃদ্ধি পায় (গ) নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করে	১৩ জন ২২ জন ১৫ জন	২৬% ৪৪% ৩০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনের দলীয়করণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করে কিনা মতামত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে ৪৪% জনমত বলছে যে প্রশাসনের দলীয়করণের ফলে নির্বাচনী দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়, ৩০% নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করে, ২৬% নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে।

প্রশ্ন ঃ ১৬. বাংলাদেশের রাজনীতিতে জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ কম। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি ?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) ৮০ শতাংশ লোক গ্রামে বসবাস করেন, গ্রামের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর, কাজেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ কম	৩০ জন	৬০%
	(খ) শুধুমাত্র ভোটদানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেন	২০ জন	৪০%
	(গ) রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ বেশী	০ জন	০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালার ফলাফল বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, ৬০% জনমত মনে করে ৮০ শতাংশ লোক গ্রামে বসবাস করেন, গ্রামের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর, কাজেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ কম। ৪০% জনমত মনে করে শুধুমাত্র ভোটদানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ঃ ১৭. নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে গ্রহণ করছেন ?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ)			
ছাত্র / ছাত্রী	(ক) অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ	১২ জন	২৪%
রাজনীতিবিদ	নির্বাচনের জন্য কিছুটা পরিবর্তন		
চাকুরিজীবী	চায়	২২ জন	৪৪%
ব্যবসা	(খ) গনতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন		
অন্যান্য	ব্যবস্থার সংস্কার চায়	১৬জন	৩২%
	(গ) নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার চায় না		
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালার ফলাফল বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৪% জনমত মনে করে যে, রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার চায়, ৩২% নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার চায় না, ২৪% অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কিছুটা পরিবর্তন চায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ঃ ১৮. নির্বাচনী দুর্নীতির ফলে জাতীয় বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে কি? হ্যাঁ / না। হ্যাঁ হলে তা কি ধরনের?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় (খ) গনতন্ত্রের চৌর্য বৃত্তি ঘটে (গ) রাজনৈতিক সুষ্ঠু ধারা ব্যাহত হয় (ঘ) দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়	৪ জন ৭ জন ২১ জন ১৮ জন	৮% ১৪% ৪২% ৩৬%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালায় গৃহীত জনমতের ৪২% মনে করেন, নির্বাচনী দুর্নীতির ফলে দেশের ভাবমুর্তি নষ্ট হয়, ৩৬% মনে করেন রাজনৈতিক সুষ্ঠু ধারা ব্যাহত হয়, ১৪% মনে করেন গনতন্ত্রের চৌর্যবৃত্তি ঘটে, ৮% মনে করেন মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়।

প্রশ্ন ঃ ১৯. আপনি সেটেলাইট চ্যানেল দেখেন কি? দেখলে কি ধরনের অনুষ্ঠান বেশী প্রাধান্য দেন?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) মুভি (খ) খেলাধুলা (গ) সংবাদ (ঘ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ঙ) শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান	৫ জন ১০ জন ১৪ জন ১৬ জন ৫ জন	১০% ২০% ২৮% ৩২% ১০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

জনমত প্রদানকারীদের ৩২% সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ২৮% সংবাদ দেখেন। যা কিনা সচেতনতা এবং জানার বিষয়টিকে প্রতীয়মান করছে।

প্রশ্ন ঃ ২০. আপনি নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ পড়েন কি?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার প্রকারভেদ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষক (কলেজ) ছাত্র / ছাত্রী রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী ব্যবসা অন্যান্য	(ক) হ্যাঁ (খ) না	৪৬ জন ৪ জন	৯২% ৮%
		মোট৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ পড়েন কিনা জনমতে দেখা যাচ্ছে ৯২% জনমত নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ পড়েন এবং ৮% জনমত নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ পড়েন না। যা প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের জনমতের প্রায় সবাই নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন।

"বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক গবেষণার প্রশ্নমালার জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের বিশ্লষণে বলা যায়

Dhaka University Institutional Repository

যে, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা বলতে বুঝায়- নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে তাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, কর্মক্ষম, কল্যাণ প্রয়াসী ব্যবস্থায় রূপান্তরিতকরণ। সেজন্য দেশের রাজনীতিতে জাতীয়স্বার্থ এবং জনস্বার্থ সংরক্ষনের জন্য কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। সেজন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতান্ত্রিক চেতনায় সিক্ত করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সর্বাধিক সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। নির্বাচনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, পেশীশক্তি ও অবৈধ অর্থের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। প্রশাসনকে আরো গতিশীল হয়ে নির্বাচনী কাজে সহযোগিতা করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক তার অন্তরে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রত্যাশা পোষন করে। মূলত এখানেই দেশের অগ্রযাত্রা নির্ভর করে। সে লক্ষ্যে আমাদের সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে যেন একটি চমৎকার নির্বাচনী সংস্কৃতি উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

উপসংহার

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক বিশ্বে নির্বাচনের গুরুত্ব তুলনামূলক অনেক বেশী। জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার বলে তাদের নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি মনোনীত করেন নির্বাচনের মাধ্যমে। তাই গণতন্ত্রের সাথে নির্বাচন ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। কিন্তু এ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ না হলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থাৎ নিজ মতামতের প্রতিফলন ঘটে না। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে না পারলে জনগণের ভোটের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুন্ন হয়ে যাবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নড়বড়ে হয়ে পড়বে। প্রাচীন নগর রাষ্ট্রে নাগরিকগণ একত্রিত হয়ে দেশ শাসনের বিধি বিধান নির্ধারণ করতো এবং সেভাবে দেশ পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে রাষ্ট্রের আয়তন বেড়ে যায় এবং সে হারে বাড়ে জনসংখ্যা, জন্ম নেয় রাজতন্ত্র বা অভিজাত তন্ত্রের। রাজতন্ত্রের ছায়াতলে সময়ের পরিক্রমায় জন্ম নেয় একনায়কতন্ত্র। ফলে হারাতে হয় নাগরিক অধিকার। এমনি এক পর্যায়ে ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লব রাজতন্ত্রের সমাধির উপর পার্লামেন্টের সৌধ নির্মাণ করে।

নির্বাচন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে। শাসক ও শাসন পদ্ধতির বৈধকরণের ব্যাপারে নির্বাচন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই এ কথা সত্য। শুধু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নয়, বৈপ্লবিক সরকার বা সামরিক একনায়কতন্ত্র ও নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের শাসনের বৈধতা প্রমাণে উদ্যোগী হয়। জনগণের সর্মথন ও আনুগত্য নির্বাচনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। অনেকে গণতন্ত্র বলতে নির্বাচিত সরকারকেই বুঝান। নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সংস্কৃতির তারতম্য যাচাই করা হয়। আধুনিক জাতি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের ফলে ঐতিহ্যগত নির্বাচন পদ্ধতির রূপান্তর ঘটেছে। নির্বাচন এখন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। তারপরও তাকে জনমতের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কারণ রাজনৈতিক দলের লক্ষ্যই হল

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো। জনগণের সমর্থন নিয়েই একটি দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে এবং জনগণের আস্থা অনাস্থার উপর তার উত্থান পতন নির্ভর করে। তাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের বিকল্প কিছু নাই। গণতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থার গুরুত্ব অসীম। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণ এ গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছে। লাভ করেছে নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার। নির্বাচন ব্যবস্থা জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল আধারে পরিণত করেছে। একটি চমৎকার নির্বাচন রাষ্ট্রের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল করার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের ভিত জোড়দার করে।

নির্বাচনী সংস্কার মানে নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করা। এর মূল লক্ষ্য হল অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশ নেয়া থেকে দূরে রাখা বা নির্বাচিত হওয়া থেকে বিরত রাখা, তাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য ভোটারদের দেয়া, নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করা, নির্বাচনী বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা, নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা এবং কমিশনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। আর এ লক্ষ্যে যে আন্দোলন তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করেছি তাই হল নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার আন্দোলন। সমাজের সকল স্তর থেকেই নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারকে স্বাগত জানিয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এ গবেষণা কর্মে তাদের ভূমিকাকেই তুলে ধরা হয়েছে।

সকল বিষয় এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়নি। শুধুমাত্র 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন' এর আলোকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা, সমস্যাবলী, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির মনোভাব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার অনুমিত বিষয়গুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা যায় যে বাংলাদেশে যথাযথ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে না উঠায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

ধ্রুপদী ও আধুনিক উভয় দর্শনের অঙ্গনে নির্বাচনকে শুধুমাত্র ইতিবাচক হিসেবেই যে বর্ণনা করা হয়ে থাকে তা নয়। উভয় ক্ষেত্রেই নির্বাচনকে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক মূল্যায়নের প্রয়াস রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের একটি জনপ্রিয় শ্লোগান হচ্ছে, " ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা বদলায় কিন্তু জনগণের ভাগ্য বদলায় না "। এ সমস্ত দেশে ব্যালট প্রথা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ক্লিষ্টতা থেকে আপামর জনসাধারণকে মুক্ত করতে পারছে না। নির্বাচন ও গণতন্ত্রের প্রতি অতিমাত্রায় প্রত্যাশা ও বিপরীতভাবে এর প্রতি হতাশা ও অবজ্ঞা- এ দু ধারার কোনটিই যুক্তিযুক্ত নয়। বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, কিছু ব্যতিক্রম ভিন্ন (নির্বাচিত স্বৈরাচার), সর্বজনীন ভোটাধিকরের ভিত্তিতে নির্বাচন পদ্ধতির বিকল্প নাই।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

1. Palmer, Norman D., "The Indian Political System", Boston: Houghton Mifflin Company, 1961, p. 182.
2. Jahan, Rounaq, "Pakistan: Falure in National Integration" New York: Columbia University Press, 1972, p. 1.
3. Huntington, S.P., "Political Order in changing Societies", New Haven: Yale University Press, 1968,pp. 377-403.
4. Jahan, Rounaq, "Bangladesh Politics: Problem and Issues", Dhaka: University Press Ltd., 1980.pp. 97-98.
5. Banu, A. U. B. Razia Akter, " The Fall of The Sheikh Mujib Regime- An Analysis", The Indian Political Science Review, Vol. XV, No.1, 1981, p. 18.
6. Maniruzzaman, Talukdar, "Bangladesh Revolution and its Aftermath", Dhaka: University Press Ltd., 1988,pp. 178-80; Hakim, M.A. Huque. A.S. "Constitutional Amendments in Bangladesh," Regional Studies, Vol, X II, No. 2, Spring 1994, p.78.
7. Huque, A.S. and Hakim, M.A. " Election in Bangladesh: Tools of Legitimacy," Asian affairs, Vol. 19, no. 4, 1993, pp. 249-267.

Dhaka University Institutional Repository

8. Maniruzzaman, Talukdar, "The Fall of the Military Dictator: 1991 Elections and The Prospect of Civilian Rule of Bangladesh," Pacific Affairs, Vol, 65, No. 2, 1992, p. 223; Hakim, M.A. "The Shahabuddin Interregnum", op. cit., p.75.

9. Seymour M. Lipset, "Social Conflict, legitimacy and Democracy" London: Heinemann Educational Books Ltd. Reprint 1971, p.77- 98

10. Muhith, A.M.A., " Bangladesh, Emergence of a Nation", Dhaka University Press Ltd.1978

11. Shelly, Mizanur Rahman, "Emergence of a New Nation in a Multi-Polar World", Bangladesh Dhaka University Press Ltd.

12. Bruyce, Lord, " Modern Democracies", London: Macmillane & Company Ltd.

13. Jennings, Sir Ivor, " Parliament" Cambrige: Cambrige University Press 1969.

14. Finer, S.E., "The Man on Horseback: The Role of The Military in Politics", London: Pall Mall Press. 1962

15. Rahman, Zillur, "Martial Law of Martial Law, Leadership Crisis in Bangladesh" , Dhaka University Press Ltd 1984

16. Ahmed, Mohiuddin, "Bangladesh Towards 21stCentury", Dhaka : Community Development Library

17. Hungtington S.P, "The Solder and the State: The Theory and Politics of Civil Military Relation". Cambrige: Cambrige University Press

Dhaka University Institutional Repository

18. Hasanuzzaman, Al Masud, "Role of Opposition in Bangladesh Politics'' Dhaka, The University Press Limited

19. Ashraf, Ali, "Development Issues of Bangladesh'' Dhaka, The University Press Limited.

20. Ahmed, Fakhruddin ''Critical Times: Memoirs of a South Asian diplomat'' The University Press Limited.

21. Stiglitz, Joseph ''State Versus Market: Have Asian currency crisis affected the reform debate'' The University Press Limited.

22. Siddiqui, Kamal ''Towards Good Governance in Bangladesh: Fifty unpleasant essays'' The University Press Limited.

23. Rahman, M.Mahbubur ''Bureaucratic Response to Administrative Decentralization-A study of Bangladesh civil service'' The University Press Limited.

24. Choudury, Dilara, ''Democracy in Bangladesh: Problems and Prospects'', Asian Studies, No. 12, June 1993. P. 1

25. Waddell, J.R.E., "An Introduction to Southeast Asian Politics", New York: John Wiley and Sons Australasian, 1972. P. 268.

26. Pye, L.W., "Aspect of Political Development", New Delhi: Amerind Publishing Co. 1972, P. 108

27. Weiner, Myron, "Party Building in a new Nation": The Indian National Congress, Chicago: The University of Chicago Press Limited. 1967. P. 4

Dhaka University Institutional Repository

২৮. Dhaka courior, 7th June 1996, and FEMA, 1996 Election Report, এবং প্রফেসর্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, নভেম্বর২০০১, পৃ-৬৫

২৯. হক, ড. আবুল ফজল, বাংলাদেশের রাজনীতি : সংঘাত ও পরিবর্তন (১৯৭১-১৯৯১), রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৪১

30. Dhal, Robert A., "Polyarchy : Partipation and Opposition", New Haven, Yale University Press, 1971, p.p.-3-20

31. Verba, Sidney, Norman H. NieJae-on-kim, "Political Particiapation and Political Equality"; A Seven Nation Comparison, Cambridge University Press, 1978, p.p. 46-47

32. Schumpeter, Joseph, "Capitalism, Socialism and Democracy", Union Paperbacks, 1987, p-269

33. Huntington, S.P., "The Third Wave : Democratzation in the Late Twenty Century", University of Oklahama Pre 1991, p-174

৩৪. আলম, মোঃ শামসুল, "রাজনীতি ও হরতাল : বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট", রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১

৩৫. আহমদ, ড. এমাজ উদ্দিন, "আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি" দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ আগস্ট-২০০১

36. Ahmed, K.S. and Kahan, M. Solimullah, "System, Party prefernce and Voting Behaviour : A Case study of Four Villagers", in the Journal of Statistical Studies, December, 1

Dhaka University Institutional Repository

37. Khan, Shamsul Islam; Islam S/ Aminul; Haque M. Imdadul, Political Cultlure, Political Parties and the Democratization in bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1996:1

38. Almond, Gabriel A. and Sidney Verbal, "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Boston : Little Brown and co, 1965, p.p. 356-360

39. Sarori, Giovanni, "Parties and Party System: A Framework of Analysis", Vol. 1, Cambridge University Press, 1976, pp.

40. Held, David, "Models of Democracy", Polity Press, 1977, p. 194

41. Ali, Raisa, "Representative Democracy and Concept of Free and Fair Elections", New Delhi, Deep and Deep publications, 1996, p-19

৪২. রশীদ, মোহাম্মদ আবদুর, "নির্বাচন সংক্রান্ত দর্শন ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আচরণ : তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত", সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৫৭, আগষ্ট ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩১

৪৩. রহমান, মোঃ মাকসুদুর, "রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা", রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয় প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৪১০-৪১১

৪৪. ঠাকুর, আব্দুল হান্নান, "নির্বাচন", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-১

৪৫. হক, আবুল ফজল, "বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি", ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৩৮-৪২

46. Mannan, Md. Ablul, "Quest for a Democratic Order in Past Independent Bangladesh (1972-75)" Asian Studies, No-18, June 1999, p-43

Dhaka University Institutional Repository

47. Hassanuzzaman, Dr. Masud, "Jatiya Sangsads (legisl-atures) in Bangladesh: An Overview", Asian Studies, No. 8, June 1999, P-57

48. Shahidullah, A.K.M., "Electoral Politics In Bangladesh : A study of 1981 Presidental Election", Social Science Review, Vol-1, December of 1981

49. Khan, Md. Mohabbat and Habib, Md. Zafarullah, "The 1979 Perliamentary Election in Bangladesh", in Ahmed, Emajuddin, Ed., Bangladesh Politics, Dhaka, Centre for social studies, 1980, p.p. 117-135

50. Thiagraph, Jeevan, "Governance and Eloctoral Porcess in Bangladesh", New Delhi, Vikas Publshing House, Pvt. Ltd., 1997. p-9

51. Mannan, Md. Abdul and Alam, Md. Shamsudul, "The June 1996 Parliamentary. Election : A Quest for Stability And Democracy", Asian Studies, No-16, June 1997, p.p.14-24

52. Bhuiyan, Sayefullah and Goswami, Arun Kumar, "The June 1996 Parliamentary Election in Bangladesh : A Review", Social Science Review, Vol-xv, no-2, December 1998, p-26

53. Bangladesh, Parliamentary Election' 96 Observation Report, Election to the Parliament 1996, Dhaka, BMSP(CCHRB,) July 1996, P-23

54. Ahmed, Fakhruddin, "The Caretakers : A first Hand Account of Interium Government of Bangladesh 1990-91", Dhaka, University Press Limited, 1998

Dhaka University Institutional Repository

55. The Parliamentary Election in Bangladesh 12 June 1996, The Report of the Commonwealth Observer Group, Britain Commonwealth Secretariate, 1997 Britain, p.p.3-4

56. রহমান, সৈয়দ সাদিকুর, অষ্টম জাতীয় সংসদ : আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু, সচিত্র বাংলাদেশ, Vol-22, No-22, November-2001, CT-11-13

৫৭. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১, প্রফেসর্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ঢাকা, প্রফেসর্স প্রকাশন, নভেম্বর-২০০১, পৃ-৬৫-৬৭

৫৮. দেবাশিষ চক্রবর্তী, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান", কলকাতা, সেন্ট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টার প্রাইজ, জুন ১৯৯৪ পৃঃ ১৭৬

59. Chowdhury, G.W, "Democracy in Pakistan": p-11

৬০. ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল, বঙ্গীয় আইন সভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৯)

61. Banerjee. S.N., "A Nation in the Making", (Calcutta 1925) p-85-86)

৬২. Hussein, Shawkat Ara, "Politics and Sociaty in Bengal"

৬৩. আহমদ, আবুল মনসুর, "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর", নওরোজ কিতাববিস্থান, (ঢাকা-১৯৭০) পৃ-৫৫

৬৪. রশিদ, হারুন অর "বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্বমুলক সরকারের ক্রম বিকাশ (১৮৬১-২০০১)" পৃ-৫৭

65. Richard L. Park and Richard S. Wheeler, "East Bengal Under Governor Rule" For Eastern Survey, 23 (1954), 129

৬৬. আহমেদ, কামাল উদ্দিন, "চূয়ান্ন সালের নির্বাচন : স্বায়ত্ব শাসন ১৭০৮-১৯৭১", এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৯২, পৃ-৪৬৯

Dhaka University Institutional Repository

67. Chowdhury, G.W., "Democracy in Pakistan", (Dacca 1963) 56-57

৬৮. ড. আবুল ফজল হক, "বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি", রংপুর, ১৯৯৫, পৃঃ ১-২

69. Holiday, 14 June, 1970

70. Maniruzzaman, Talukdar, Redical Politics and Emergence of Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Books International Ltd.1975.P.41.

৭১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত পৃ-৪

৭২. রহমান, সিরাজুর, ইতিহাস কথা কয় ও নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, পৃ-৩১, শিকড়, ২০০২)

৭৩. Westergeard, Kristen, "State and Rural Society in Bangladesh", Select Book Services Ltd. New Delhi, 1986, P.100;

৭৪. কায়সার,আশরাফ, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকান্ড", মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ-১১০

৭৫. রহমান, সিরাজুর; "ইতিহাস কথা কয় ও নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ", পৃ-১১৬

৭৬. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৬ মে, ১৯৮৬

৭৭. বদিউল, আলম মজুমদার, নব্বইয়ের অঙ্গীকার বরখেলাপের পরিনাম, প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর ২০০৭

৭৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, নভেম্বর-১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ১৬ মার্চ-১৯৯১

৮০. দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

৮১. ইনকিলাব, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

৮২. আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, দুর্নীতির স্বরূপ অন্বেষণ ঃ বাংলাদেশ" নিবেদন প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯১, পৃ-১৪৬

৮৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

৮৪. দৈনিক যায়যায় দিন, ৬ নভেম্বর ২০০৬

৮৫. The CCHRB Election Observation Report: The Eight Parliamentary Election 2001. P16-17

86. Akther, Yeahia, Mohammad, "Election Corruption in Bangladesh", Ashate, 200, P-150

৮৭. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১৬ জুলাই, ২০০৫

৮৮. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা-৩০ অক্টোবর, ২০০৬

৮৯. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬

৯০. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২৩ নভেম্বর ২০০৬

৯১. আকবর আলী খান, লে.জে. অবঃ হাসান মশহুদ চৌধূরী, সি.এম. শফি সামি ও সুলতানা কামাল পদত্যাগ করেন

৯২. যুগান্তর, ঢাকা-১১ জানুয়ারী ২০০৭

৯৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১২ জানুয়ারী ২০০৭

৯৪. মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৯৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারী ২০০৭

৯৬. জগলুল আল, "দেশ বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-৮৯" ঢাকা ঃ প্রতীক প্রকাশনা, সংস্থা, ১৯৯০ পৃষ্ঠা- ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

৯৭. এ ধরনের অভিযোগকারীদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের তদানীন্তন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক যথাক্রমে আবদুল মালেক উকিল, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ, মুসলীম লীগ নেতা খান এ, সবুর, আওয়ামী লীগ (মিজান) এর সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী, এবং জাসদের শাজাহান সিরাজ। দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক ১৯শে এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯

৯৮. সাপ্তাহিক রোববার, ১১ই মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-১১

৯৯. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ই মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২০

১০০. এ তিনজন বৃটিশ নাগরিক ছিলেন, লর্ড এ্যানালস, মার্টিন ব্রাউন ব্রাভো (এমপি) ও বিবিসি'র ডেভিড জনলে।

১০১. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ই মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ২৩, ২৪ ও ২৭

১০২. এ সকল বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন, লস এ্যাঞ্জেলস পত্রিকার সংবাদদাতা বন টেমেষ্ট, টাইমস পত্রিকার মাইকেল হ্যামিলন, ফিনানসিয়াল টাইমস এর জন এলিয়ট গার্ডিয়ান পত্রিকার এরিখ সিলভার, নিউইয়র্কটাইমস এর ষ্টিফেন আর, ওয়াইজম্যান প্রমূখ।

১০৩. এ সম্পর্কিত মার্ক টালীর প্রতিবেদন বিবিসি থেকে ৭ই মে, ১৯৮৬, রাতে প্রচারিত হয়।

১০৪. সাপ্তাহিক রোববার, ১০ই মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ১১

১০৫. ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নির্বাচন না বলে বুথ দখলের খেলা' হিসাবে বর্ণনা করা হয়। দেখুন সাপ্তাহিক রোববার, ১১ই মার্চ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৯

১০৬. সাপ্তাহিক রোববার, ৬ই মার্চ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ১৫-১৬

১০৭. প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারী ২০০৭

১০৮. Hariharan, A; "India, A Common Goal : Get Rich Quick" Far Eastern Economic Review 85,35 6th September, 1974 পৃঃ ২৫

১০৯. অনাদিকুমার মহাপাত্র, "আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান"। কলকাতা, ২০০২, পৃ-৮৫২

Dhaka University Institutional Repository

১১০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ঢাকা , ১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত, পৃ-১৯

১১১. বাংলাপিডিয়া

১১২. বাংলাদেশ গেজেট, আর পিও, ফেব্রুয়ারী ২৪, ২০০৯

১১৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮

114. Jahan, Rounaq, "Bangladesh in 1973; Management of Factional Politics", P-128

115. Adam ,Seligman, "The Idea of Civil Society". New York, Free Press, 1993

১১৬. হোসেন সৈয়দ আনোয়ার, "গণতন্ত্র ও সিভিল সমাজ চাওয়া পাওয়ার হিসাব" অরুপরাহী সম্পাদিত সিভিল সোসাইটি রাজনৈতিক পর্যালোচনা লোকজ পৃ- ৬২, ১৯৯৯

১১৭. রহমান, দিলারা ও হক মোঃ আসিরুল " সিভিল সোসাইটি ও বাংলাদেশ"তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, পৃ, ৩৩৫

১১৮. মামুন, মুনতাসির ও রায় জয়ন্ত কুমার "বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম" ঢাকা অবসর প্রকাশনী, ১৯৯৫

১১৯. ১২ ভোরের কাগজ, ২৯-০৭-১৯৯৭

১২০. রনো, হায়দার আকবর, "সিভিল সোসাইটি ও আজকের বাংলাদেশ "সাপ্তাহিক ২০০০, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪৬, ২৮ মার্চ, ২০০৮, পৃ- ২০

১২১. রহমান, ড. আতাউর "নাগরিক সমাজ ও সুশাসন" ফকরুল চৌধুরী (সম্পাদিত) "সিভিল সোসাইটি তত্ত্ব প্রয়োগ ও বিচার, কথা প্রকাশ, ঢাকা- ২০০৮, পৃ- (১১২-১২৩)

১২২. প্রথম আলো, ২৬ জানুয়ারী ২০০৭

১২৩. প্রথম আলো ১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

১২৪. প্রথম আলো, ৩০ মে, ২০০৭

১২৫. প্রথম আলো, ৯ মে ২০০৭

১২৬. প্রথম আলো, ১৯মে ২০০৭

১২৭. প্রথম আলো, ৭জুন ২০০৭

১২৮. দৈনিক ইত্তেফাক ৭ জানুয়ারী ২০০৭